সাহিত্য-পরিক্রমা

হরপ্রসাদ মিত্র, এম-এ,

বাংলা সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, উত্তরপাড়া কলেজ ও
রামকৃষ্ণ মিশন্ বিদ্যামন্দির। রামতনু লাহিড়ী-গবেষণা
বৃত্তিভোগী এবং সহযোগী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, পি-এইচ ডি

—শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের কথা

'সাহিত্য-পরিক্রমা'র অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

'গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি গুরুদেবের তিরোধানের অল্প-কাল মাত্র পূর্বে 'পরিচয়' পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি এই লেখাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আমাকে এবং আমার বয়োজ্যেষ্ঠ একাধিক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের উদ্দেশে পত্রাঘাত করেছিলেন। তাঁর উৎসাহবাণীতে উদ্দীপনাপূর্ণ, শ্রেষ্ঠত্ববাচক যে সব বিশেষণের পুরস্কারলাভ করেছিলাম, সেগুলি আমার যথোচিত প্রাপ্যের বেশি পাওনা। কিন্তু তিনি যে আন্তরিক সন্তোষলাভ করেছিলেন, আজ গ্রন্থাকারে সেই লেখাটির পুনর্মুদ্রণের সময়ে, সে কথা ভেবে গৌরব অনুভব করছি।

দুর্মূল্য কাগজ এবং দুঃসাধ্য মুদ্রণের দুর্যোগ স্বীকার করেও 'মিত্র ও ঘোষ' সংসদের অধিনায়কদ্বয়, সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গজেন্দ্র-কুমার মিত্র ও সুমথনাথ ঘোষ এই বইখানি প্রকাশের ভার নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

আমার শ্রদ্ধাস্পদ যে সব শিক্ষক ও প্রীতিভাজন যে সব ছাত্রের সান্নিধ্যে এই লেখাগুলি দিনে দিনে জমেছে, তাঁদের উদ্দেশে আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদনের এই সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হলাম।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,

গ্রন্থকার

১লা আগষ্ট, ১৯৪৬

মুদ্রণ-ত্রুটির সংশোধন

পৃঃ ২৬, পংক্তি ২য—'পর বৎসর' **স্থলে** 'কযেক বৎসব পরে'।

পৃঃ ২৮, পংক্তি ২০শ—'পূর্বোক্ত চারজন কবি' **স্থলে** 'পূর্বোক্ত তিনজন কবি'।

পৃঃ ৩০, পংক্তি ৫ম—'কাব্যে ; প্রকৃতি-চিত্র' **স্থলে** 'কাব্যে প্রকৃতি-চিত্র'।

এই পুস্তকের মুদ্রণে ৮০ পৃষ্ঠা অবধি 'অনুস্বর'-প্রয়োগে অসতর্ক বাহুল্য ঘটেছে। পববর্তী অংশে বিশ্ববিদ্যালযেব নিযম অনুযাযী বানান ব্যবহৃত হযেছে।

সাহিত্য-পরিক্রমা

ভারতচন্দ্র

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা দেশের ইতিহাস ষড়যন্ত্র এবং বিদ্বেষে কণ্টকিত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধেই এই বিক্ষোভের সূত্রপাত ঘটেছিল। বিদেশী বণিকের বাণিজ্যসম্ভার ভারতবর্ষের বিভিন্ন বন্দরে এই সময়ে থরে থরে সাজানো,—দেশের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী দিয়ে দেশের সর্বাংগে সেই বিচিত্র পণ্যসামগ্রী ছড়িয়ে পড়ছে এবং তারই সঙ্গে ভারতের উপকূল থেকে প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত প্রসারিত হচ্ছে নানা দেশের নানা লুব্ধদৃষ্টি। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেই ভারতে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' প্রতিষ্ঠা ঘটেছে, তারপর ফরাসী, ইংরাজ, পর্তুগীজের তুমুল কলহ,—হিন্দুস্থানের মানচিত্রে বাংলাদেশ সর্বাধিক স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে,—সুজা, সরফরাজ, আলিবর্দী; কয়েকটি ক্ষণস্থায়ী

নবাব, কিছু চক্রান্ত আর জিঘাংসা,—এই তো অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। এই বিক্ষুব্ধ, আলোড়িত, স্বল্পালোকিত, বিপৎসংকুল সমুদ্রে আলোকস্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আছে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভা। সমসাময়িক বাংলাদেশের ধূর্ততা আর শাঠ্য, বুদ্ধির প্রখরতা, জীবনেব সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতার শ্রীহীন জৌলুষ—এই বিচিত্র উপকরণে ভূষিত এই ভূস্বামীর সভাটিকে সে-যুগের সভ্য বাংলার প্রতীক বলা যেতে পারে। ভারতচন্দ্রের জীবনের কর্মবহুল দিনগুলি কেটেছিল এই সভায়। তাই 'অন্নদামঙ্গলের' লেখক ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর প্রকৃতপক্ষে 'বিদ্যাসুন্দর'-এরই কবি।

প্রাগাধুনিক যুগের বাঙালি কবিরা ছিলেন পূর্ণমাত্রায় আত্মসচেতন। তাই তাঁদের রচনার ভূমিকায় দেবাদেশের ইংগিত থাকলেও নিজেদের দেবদুর্লভ কবিত্বশক্তির পরিচয়-পত্রও সংক্ষিপ্ত হতো না। একজন 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচয়িতা তাঁর পূর্ববর্তী লেখকের অক্ষমতা এবং অসাফল্য ঘোষণা করে নিজে গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়েছেন: প্রথম লেখক সম্বন্ধে এই দ্বিতীয় ব্যক্তির উক্তিটি হ'চ্ছে,

"মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরি দত্ত।..."

ভারতচন্দ্র অবশ্য এ ধরণের গালিগালাজে কালক্ষেপ করেন

নি। কিন্তু তাঁর রচনায় একাধিক স্থলে তাঁর অলৌকিক শিল্পচাতুর্য সম্বন্ধে মহা মহা বিশেষণ প্রয়োগ করতে তিনিও ছিলেন অকুন্ঠিত। হয়তো সকলকালেই কবিরা অল্পবিস্তর বিনয়মুক্ত। বৈষ্ণব-পদাবলী রচয়িতা এবং জীবন-চরিতকার সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম মাত্র। সুখের বিষয় ভারত-চন্দ্রের আত্মচৈতন্য নিপীড়ক নয়। তিনি সততাপরায়ণ। ঘোষণা করেই তিনি ক্ষান্ত হন না,—প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করেন।

নবাব আলিবর্দীর প্রার্থিত বারো লক্ষ টাকা দিতে অসমর্থ হয়ে মুর্শিদাবাদের কারাগারে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন বন্দী ছিলেন তখন অন্নপূর্ণা তাঁর পূজা প্রবর্তনের স্বপ্নাদেশ দেন ; সেই সঙ্গে দেবী বলে দিলেন,

সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।
মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়॥
তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও॥

ভারতচন্দ্র 'মহাভক্ত' ছিলেন কি না জানা যায় না। অন্নদা বা অন্নপূর্ণা প্রাচীন-কালের বাংলা দেশের অন্যান্য 'মঙ্গল কাব্যের' দেবদেবীর প্রথানুসারে আত্মপ্রচারনিষ্ঠ এবং সর্বসংকটত্রাত্রী। অকৃত্রিম ভক্তের দৃষ্টিতে রায়গুণাকর

তাঁকে একবারও দেখেন নি। তিনি প্রাচীন কবিদের কাছেই ভক্তির পাঠ নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই। কিন্তু 'মহাকবি' তাকে সত্যই বলা চলে। এবং এ সম্মানের হেতু তাঁর রচনার বিষয়বস্তু নয়,—তাঁর প্রকাশভঙ্গী, তাঁর অভিনব বাক্‌চাতুর্য, তাঁর গ্রাম্যতাবর্জিত নবত্ব!

প্রাচীন কাব্যের ধারায় অভ্যস্ত বাঙালি পাঠক বিদ্যা-সুন্দর পড়তে পড়তে চমকে উঠলেন। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম ছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী লেখক। তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গলের' সংগে ভারতচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল,—তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় ভারত-কল্পিত হরি হোড়ের উপাখ্যানে। সোনা হরি হোড় বৃদ্ধ বয়সে তরুণী ভার্যা সোহাগীর কলহ প্রবণতা বশতঃ লক্ষ্মীর বিরক্তিভাজন হলেন। এই সোহাগী ঝড়ু দত্তের কন্যা এবং ঝড়ু দত্তের পরিচয় প্রদান প্রসংগে-রায় গুণাকর লিখেছেন—

"আমনহাঁড়ার দত্ত ছিল ভাড়ু দত্ত।
তার বংশে ঝড়ু দত্ত ঠক মহামত্ত॥"

এ-ছাড়া হীরা মালিনীর চরিত্র বর্ণনার মধ্যেও মুকুন্দরামের স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শোনা যায়। বর্ধমানে নবাগত সুন্দর, হীরা মালিনীর আশ্রিত। হীরা সুন্দরের প্রদত্ত টাকাকড়ি

তুলে রেখে নিজের সঞ্চিত মেকি মুদ্রাগুলি নিয়ে বাজারে গেছে এবং সেখানে—

"রাঙ্গা তামা মেকী মেলে রাশিতে মিশায়ে ফেলে
বলে বেটা নিলি বদলিয়া।
কাঁদি কহে কোটালেরে বাণিয়ারে ফেলে ফেরে
কড়ি লয় দু'হাতে গণিয়া॥"

ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী আর একজন কবি,—কৃষ্ণরাম দাস সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে 'কালিকামঙ্গল' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর বইখানির মধ্যেও বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানেও মালিনীর বেসাতির অনুরূপ বর্ণনা আছে। তবে সেখানে মালিনীর নাম হীরা নয়,—বিমলা। এই বিমলাও অত্যন্ত চতুর—

অগুরু চন্দন চুয়া চাইতে চাইতে।
চক্ষ ঠিকরিয়া যায় আছে কি পাইতে॥

সুতরাং দেখা যায়, মুকুন্দরামের দুর্বলা, কৃষ্ণরামের বিমলা এবং ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনী একই গোত্রের বিভিন্ন ব্যক্তি। এরা শুধু প্রতিবেশী নয়, পরস্পর আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ। বিষয়বস্তু হিসাবে এই সব উপকরণ ভারত-চন্দ্রকে সৃষ্টি করে নিতে হয়নি। 'অন্নদামঙ্গলের' 'শিবায়ন'

এবং 'বিদ্যাসুন্দর'—এই দুটি অংশের কাহিনী ভারতচন্দ্রের পূর্বেই প্রচলিত ছিল। তিনি কেবল মাঝে মাঝে পাত্র-পাত্রীর পিতৃপরিচয়ে নূতনত্ব সাধন করেছেন অথবা প্রচলিত কাহিনীর ঈষৎ পরিবর্তন ঘটিয়েছেন; তবে 'মানসিংহের' কাহিনী রায় গুণাকরের নিজস্ব সৃষ্টি। এ ছাড়া তৎকালীন রুচি অনুসারে মুসলমানী আদবকায়দায় অভ্যস্ত বাঙালি 'লয়লা-মজনু' 'গোলেবকাওয়ালী' 'জেলেখা' প্রভৃতি ফার্শী কাব্য নাটকাদির ভক্ত ছিলেন। ভারতচন্দ্র সমসাময়িক বাঙালি পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্যই তাঁর গ্রন্থে পূর্বোক্ত কাব্যাদি-বর্ণিত পাত্রপাত্রীর চিত্রের প্রতিলিপি পরিবেশনে মনোযোগী ছিলেন। বস্তুতঃ 'কুটনী' চরিত্র মুসলমানী সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলেই বাংলা সাহিত্যে এই যুগে নিপুনভাবে চিত্রিত হয়েছিলো। বিষয়বস্তুর এই সব অংগ কতকাংশে গতানুগতিক ধারার প্রভাবজাত, কতক-অংশে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বংগদেশের যুগধর্মসৃষ্ট। ভারত-কবির আসল মৌলিকত্ব এখানে নয়। গতানুগতিক প্রবাহ থেকে তিনি একদিকে যেমন হীরা মালিনীর চরিত্র বর্ণনের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি বিদ্যার বিরহ বর্ণনায় বৈষ্ণব-পদাবলী রচয়িতার প্রকাশরীতি ধার করেছেন—

"তাঁরে না দেখিয়া　　　বিদরিছে হিয়া
যে দুখ তা কব কারে ॥
চাঁদের মণ্ডল　　　বরিষে গরল
চন্দন আগুন কণা।
কর্পূর তাম্বুল　　　লাগে যেন শূল
গীতনাট ঝনঝনা..."

কিন্তু বৈষ্ণব কবির "হরি-বৈমুখী হামারি অঙ্গ মদনানলে দহনা" প্রভৃতি বর্ণনার মধ্যে যে ঐকান্তিক আর্তি ধ্বনিত হয়েছে ভারতচন্দ্রের এক ছত্র রচনার মধ্যেও তার ক্ষীণতম আভাস নেই। পরবর্তীকালে এই গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করেই কবিওয়ালারা বৈষ্ণব কবিদের ব্যর্থ এবং হাস্যোদ্দীপক অনুকরণ করেছিলেন। প্রচলিত অন্যান্য মংগল কাব্যের 'বারমাস-বর্ণন' বা 'বারমাসী'র দৃষ্টান্তও ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে পাওয়া যায় এবং সুখের বিষয় তা মনোরমও বটে; কিন্তু 'চণ্ডীমঙ্গলের' ফুল্লরার বারমাস্যার মতো বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষতা তাতে নেই। এই বারমাসের সুখদুঃখ বর্ণনার সময় কবি ইচ্ছা করলে প্রকৃতি-চিত্র পরিবেশন করতে পারতেন কিন্তু খোলা চোখে বহির্জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করবার অভ্যাস অথবা ইচ্ছা,—কিছুই তাঁর ছিলো না। অথচ বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি

বা নিসর্গবর্ণনমূলক কাব্য বচনার সূত্রপাত তাঁর সময় থেকেই হওয়া উচিত ছিল, কারণ প্রথমতঃ, তিনি ছিলেন নাগরিক সভ্যতায় লালিত রাজসভার কবি, দ্বিতীয়তঃ, তাঁব আয়ুষ্কাল এদেশের ইতিহাসেব একটি কুটিল রাজনৈতিক বিবাদ-বিসংবাদ জর্জরিত অধ্যায়ের সমসাময়িক এবং তৃতীয়তঃ, তাঁব ছিলো শক্তি। অন্ততঃ পলায়নীবৃত্তিচালিত হয়েও তিনি যদি দু'ছত্র ভালো প্রকৃতি-চিত্র রচনা করতেন, তা'হলে দুটি কৃত্রিম নব-নাবীর দেহবুভুক্ষাব কাহিনী পড়তে পড়তে আমবা একটিবারও আকাশেব দিকে চোখ তুলে, ফুসফুস ভবে তাজা বাতাসের শ্বাস গ্রহণ করতে পাবতুম। এমন কি বিদ্যা-সুন্দরেব প্রথম মিলন-বাত্রিতে একটু বিচলিত হয়ে অভিনব রাত্রি-বর্ণনও তিনি করেন নি। সে রাত্রেও বহু-শ্রুত পুবাতন কুহুধ্বনিতে আমবা উৎপীড়িত হই—

"প্রথম বৈশাখ শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী।
সুগন্ধ মারুত মন্দ নিবমল শশী॥
কোকিল কোকিলা মুখে মুখে আবোপিয়া।
কুহু কুহু রব করে মদনে মাতিয়া॥"

ভারতচন্দ্র পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত, বাংলা এবং ফার্শি ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এর ফলে তাঁর

রচনায় ফার্শি শব্দের বাহুল্য, সংস্কৃত পদ, বাক্য এবং শ্লোকের প্রাচুর্য এবং ইতস্ততঃ পুরাণ-প্রসংগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। বিহ্লনের 'চৌরপঞ্চাশিকার' অনুবাদ, 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থের ভাবানুবাদ, এবং ক্ষণে ক্ষণে সংস্কৃত বাক্যাংশ বা শ্লোক সিঞ্চনেব দ্বারা রায় গুণাকর নিজের বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তবে মাঝে মাঝে এই ধরণের দেবভাষার প্রয়োগ নরলোকে উল্কাপাতের মতোই বিসদৃশ মনে হয়; যেমন মশানে চৌত্রিশ অক্ষবে অন্নদার স্তব উচ্চারণের পবে দেবী কর্তৃক স্নুন্দরের প্রতি অভয় প্রদানের বর্ণনায়,

"এইরূপে বর্ধমানে রহিলা আকাশযানে
স্নুন্দরেবে কবিয়া অভয়
মা ভৈবী: মা ভৈবী: বেটা তোরে বা বধিবে কেটা
তবে আজি কব্রিব প্রলয়॥"

অথবা চোর স্নুন্দবকে দেখে স্ব স্ব পতিনিন্দায় নিযুক্ত নারী-গণের বর্ণনা প্রসংগে,

"একে আরম্ভিতে হয় আর অবসর।
ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট ন পূর্ব্ব ন পর॥"

সংস্কৃতের প্রভাব ভারতচন্দ্রের রচনার আদ্যন্ত বিস্তৃত। অন্নদা-মঙ্গলের শিবায়ন অংশে ফার্শি প্রভাব প্রায় অনুপ-স্থিত বলা যেতে পারে কিন্তু সংস্কৃতের প্রতি তাঁর প্রীতি

অপরিবর্তিত। এই প্রসংগে একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ভাষার বিভিন্ন রীতির সার্থকতা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অবহিত ছিলেন। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, ফার্শি—এই চার বিভিন্ন ভাষার শব্দ-সম্ভার থেকে তিনি প্রয়োজন-অনুসারে শব্দ চয়ন করে কাব্য রচনা করেছেন এবং সর্বত্র একই রীতির অনুসরণ করেন নি। এ সম্বন্ধে 'অন্নদা-মঙ্গলের' 'মানসিংহ'—অংশে কবি একটি কৈফিয়ৎ দিয়েছেন,

> "মানসিংহ পাতাশায় হইল যে বাণী।
> উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী॥
> পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবারে পারি।
> কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥"
> "না রবে প্রসাদ-গুণ না হবে রসাল।
> অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥"

কিন্তু ভারতচন্দ্র এই মিশ্রিত ভাষা শুধু সর্বশ্রেণীর পাঠকের নিকট নিজের রচনা বোধগম্য করবার জন্যই ব্যবহার করেন নি। ভাষা ভাবানুসারী হওয়া উচিত এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে তার রূপের তারতম্য ঘটাই স্বাভাবিক—এ সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। ভাষা সম্বন্ধে তাঁর মনোযোগ ছিল অতি-মাত্রিক এবং যাদুকরের মতো ভাষাকে

তিনি আপন ইচ্ছামত চালিত করেছেন। অনেক সময়ে বর্ণনীয় পরিবেশ, বিষয়, ব্যক্তি-সম্পর্ক প্রভৃতি বিস্মৃত হয়ে আত্মরতিগ্রস্ত ভাষা সম্পূর্ণরূপে বিষয়বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। তখন কাকে, কোথায়, কি বলা হচ্ছে,—সে সম্বন্ধে রায়গুণাকরের খেয়াল থাকে না,—কেমন বলা হচ্ছে, তাই ভাবতে ভাবতেই তিনি বহির্জগৎ ভুলে যান। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, গুণসিন্ধু রাজার কুমার এবং বিদ্যার পিতৃদেবের বাক্যালাপ। সুন্দরের বিনয়লেশ-শূন্য, উদ্ধত, চতুর উক্তি পাঠকের দৃষ্টি ও বিরক্তি দুইই আকর্ষণ করে। 'শিবায়ন' অংশে রতিবিলাপ শিরোনামায়—

"আহা আহা হরি হরি উহু উহু মরি মরি
হায় হায় গোঁসাই গোঁসাই।"

—এই কারণেই হাস্যোদ্দীপক হয়েছে। কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত ভারতচন্দ্রের রচনান্তর্গত হলেও এই ভাষা ব্যবহারের এবং ভাষাসৃষ্টির আশ্চর্য ক্ষমতার জন্যই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। এইখানেই তাঁর সত্যকার মৌলিকতা। তিনি শব্দকুশল, ছন্দে তাঁর আশ্চর্য দক্ষতা, অলংকার ব্যবহারে তাঁর অদ্ভুত নৈপুণ্য—অষ্টাদশ শতাব্দীর কলহ-কোলাহল মুখর বংগদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে তিনিই প্রথম ঐতিহ্যানুসারী বিপ্লবী নাগরিক। তিনি গ্রাম্যতামুক্ত, তিনি বিচিত্রভাষী,

তিনি বাংলা কবিতার প্রাচীন যুগেব শেষ জ্যোতিষ্ক। পৌরাণিক সাহিত্যের অনুবাদ, মংগলকাব্যের পরিচিত কাহিনীর পৌনঃপুনিক পুনরাবৃত্তি, কয়েকটি লৌকিক কাহিনীর উপাদানে রচিত কিছু ছড়া, এবং গাথা জাতীয় রচনার পঠন-পাঠনে ক্লান্ত বাঙালি যখন নতুন ভাষা এবং নতুন প্রকাশভংগীব আবির্ভাবেব প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়েছিল, সেই সময়ে নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রেব সভায় 'সত্যপীরের গান' রচয়িতা একটি বালক আশ্রয়ার্থী উপনীত হলেন। কালক্রমে বাঙালির মুখে তিনিই দিলেন নতুন ভাষা। ক্রমশঃ সেই কবির বচনাবলী—বাক্য, বাক্যাংশ এবং শ্লোক বাংলাদেশেব প্রবাদ-স্থানীয় হয়ে উঠলো। আজ কথায় কথায় আমরা 'শিবেব দক্ষালয়ে যাত্রা'র চিত্রেব উল্লেখ করি, উপমা, শ্লেষ, যমক, অনুপ্রাসেব দৃষ্টান্ত দিতে হলে ভারতচন্দ্রকে স্মরণ কবি, প্রবচনেব মতো তাঁব কবিতা-বলীর বহু পংক্তি ব্যবহার কবে থাকি। বাংলাছন্দকে তিনিই প্রথম সৌষম্যের নিয়মে বাঁধলেন, পর্বের মধ্যে ধ্বনিস্পন্দন সৃষ্টির প্রয়াস এবং বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যেব বিভিন্ন ছন্দেব ব্যবহার-নৈপুণ্যের কৃতিত্ব তাঁবই। বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দ-দাসের পরে এই একজন শব্দকুশল কবির আবির্ভাব হলো। তারপর প্রায় শতাব্দীব্যাপী কবিওয়ালার বাচালতা।

আলালের ঘরের ত্বলাল

কোনো একজন বুদ্ধিমান লোকের রচনা পড়লেই মনে হয় তিনি তাঁর পাঠকের সঙ্গে মৌখিক আলাপ করতে বসেছেন। বহিরাড়ম্বর যতো স্বল্পায়তন হয়, বক্তব্য ততোই সহজ হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে বেশ-ভূষা এবং আচার অনুষ্ঠানের বাহুল্য হৃদয়গ্রাহিতার বিপক্ষ বলেই মনে হয়। শোপেন-হাবার তাঁর এক নিবন্ধে যেখানে শৈলী বা লিখনরীতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, সেখানে তাঁর একটি চমৎকার মন্তব্য আছে। তিনি বলেছেন কথ্য রীতি এবং লেখ্য রীতি,—এই ত্নইএর সহযোগে জাত রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারাই আদর্শ রীতিতে উপনীত হওয়া যায়। বই-এর ভাষায় বিশ্রম্ভালাপ এবং বিশ্রম্ভালাপের ভাষায় বই—এই ত্নই বিভিন্ন বস্তুই সমান ব্যর্থ।

"An author follows a false aim if he tries to write exactly as he speaks. There is no style of writing but should have a certain trace of kinship with the epigraphic or monumental style, which is indeed the ancestor of all styles. For an author to write as he speaks is just as

reprehensible as the opposite fault, to speak as he writes ..."

বাংলা গদ্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, এই দুই ভিন্ন জাতীয় রীতির দ্বন্দ্ব আদিকালের অন্ধকার থেকে আরম্ভ হয়ে বর্তমান যুগের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। প্রকাশভংগী অবশ্য সব যুগেই সহজ হতে চেয়েছে। কিন্তু ইচ্ছাকৃত দুর্বোধ্যতার দিকে প্রবল একটি ঝোঁক এই ইতিবৃত্তের আদ্যন্ত প্রসারিত। এই দুর্বোধ্যতার একাধিক কৈফিয়ৎ আছে। প্রাচীন বৈষ্ণব সহজিয়া পুঁথির অন্তর্গত গদ্যের দুর্বোধ্যতা শৈলীগত নয়। সে হচ্ছে শাস্ত্রবিশেষের সংগে পাঠকসাধারণের স্বল্প পরিচয়-উৎপন্ন অস্পষ্টতা। তা'ছাড়া বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক রীতি তখনো গড়ে ওঠে নি। এই সাহিত্যিক আদর্শের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। তখন থেকে গদ্যের ধারার সংগে সংগে পূর্বোক্ত দ্বন্দ্বের ধারাটিও সমান্তরাল গতিতে অগ্রসর হয়েছে। এই ধারার পূর্ব-সীমান্তে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছত্রচ্ছায়ায় পণ্ডিতী গদ্যের দুর্বোধ্যতা, এবং এর উত্তর সীমান্তে অতি-আধুনিক সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কোনো কোনো লেখকের গদ্যরীতির কাঠিন্য। শোপেনহাবারকথিত monumental style-এর সংগে ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ স্থাপনের উদ্দেশ্য বশতঃ হয়তো এই ব্যাপারটি ঘটে থাকে। কিন্তু সে যাই হোক, আদর্শ রীতি

বলে একে আমরা গ্রহণ করি না। তবু এই দুর্বোধ্যতা-সৃষ্টিও নিস্ফল হয় না। পক্ষান্তরে কাল বিশেষে এর প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার্য। বহু হস্ত-প্রত্যাবৃত্ত মুদ্রায় যেমন সম্রাটের নামাংক মুছে যায়, তেমনি বহু জনের প্রাত্যহিক ব্যবহারে ভাষার সৌন্দর্যও বিনষ্ট হয়। তখন শব্দের শক্তি, বাক্যের পটুত্ব, এবং অর্থ-প্রকাশের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জন্য ভাষার রূপান্তরীকরণ আবশ্যক হয়। সেই প্রয়োজনবোধেই শক্তিমান লেখক নতুন প্রকাশভংগীর সৃষ্টি করেন। তাই খাঁটি সাহিত্যিক রূপের দু'দিকে অতি-সরল এবং অতি-কঠিন এই দুটি রীতির প্রবাহ সকল সাহিত্যেই বর্তমান। এবং কোনও একটি সাহিত্যের বিবর্তনের সহায়ক-রূপে সারল্যের দিকে ঐ সাহিত্যের লেখক গোষ্ঠীর অনুরাগ থাকাও যেমন প্রয়োজনীয়, দুর্বোধ্যতার আশ্রয় অবলম্বন করাও তেমনি অন্য এক লেখক-সম্প্রদায়ের পক্ষে আবশ্যক। এই দুই ভিন্ন পন্থী প্রবাহের আবর্তেই একদা বংগ-সাহিত্যে "আলালের ঘরের দুলাল" নামক বইখানির আবির্ভাব ঘটেছিল। সে যুগের সাহিত্য-গগনের সূর্য বঙ্কিমচন্দ্র এই বই সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "বাংলা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'। ইহার

কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু "আলালের ঘরের দুলালের" পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয় ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।"

বস্তুতঃ "আলালের ঘরের দুলাল" বংগসাহিত্যের রাজ-পথে একটি প্রদেশ নির্দেশক চিহ্নস্বরূপ বর্তমান। কিন্তু নবযুগের নির্দেশ প্যারীচাঁদ মিত্রের কাছেই যে প্রথম পাওয়া গেছে, তা নয়। তাঁর পূর্বে ভবানীচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়, প্রমথনাথ শর্মা—এই ছদ্মনামে, 'নববাবুবিলাস' নামে একখানি ব্যংগ-পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের 'সমাচার দর্পণে' 'বাবুর উপাখ্যান' নামক গদ্য-রচনার সঙ্গে 'নববাবুবিলাসের' সাদৃশ্য দেখে গবেষকদের ধারণা হয় যে এই দুই রচনা একই লেখকের লেখনী-প্রসূত। সুতরাং মিত্র মহাশয়ের প্রখ্যাত বইখানি মুদ্রিত হবার বহুকাল পূর্বেই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুরূপ সম্ভাবনার নির্দেশ করে গিয়েছিলেন। প্যারীচাঁদের খ্যাতির প্রকৃত কারণ তাঁর গ্রন্থে অশ্লীলতার অসদ্ভাব। তা'ছাড়া তাঁর সংযম এবং চরিত্র-চিত্রণের নৈপুণ্যও উল্লেখযোগ্য।

এই বইখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন এদেশে

লেখক-পাঠক নির্বিশেষে সকলেই এর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। জন বীম্‌স্‌ বলেছিলেন, "the best novel in the language" 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'-পত্রে পুস্তক-পরিচয় প্রসংগে এই বই-এর সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল, "We hail this book as the first novel in the Bengali language." বংকিমচন্দ্র অবশ্য বিজ্ঞ সমলোচকের ধর্মানুসারে এটিকে নভেল বা উপন্যাসের পর্যায়ে স্থাপন করেননি, এমন কি এর শ্রেণীনির্দেশের কোনও আভাসই লিপিবদ্ধ করেননি, কিন্তু তিনিও এই গ্রন্থকে প্যারীচাঁদের অক্ষয় কীর্তি বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতে প্যারীচাঁদের কৃতিত্ব দ্বিবিধ,—বাংলা ভাষায় নবযুগ নির্দেশের গৌরব এবং সাহিত্যের বিষয়বস্তু চয়নে ঔদার্য—এই দুই অধিকারেই প্যারীচাঁদ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়। বংকিমচন্দ্র এই গ্রন্থের শ্রেণীনির্দেশ না করলেও তৎকালীন সুধীবৃন্দ 'আলালের ঘরের দুলাল'-কে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলেই গ্রহণ করেছিলেন। এর সমর্থন পাওয়া যায় পূর্বোদ্ধৃত মতামত থেকে। এ ছাড়া শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পুস্তকে লিখেছেন, "কুমারখালির হরিনাথ মজুমদারের প্রণীত 'বিজয়বসন্ত' ও টেকচাঁদ

ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' বাঙ্গালার প্রথম উপন্যাস।"

উপন্যাসের বিশেষ গুণগুলি স্মরণ করলে, 'আলালের ঘরের দুলাল'কে উপন্যাসের আভাস মাত্র বলা চলে। সাধারণতঃ এই জাতীয় বিশ্লেষণে দেখা যায়, আখ্যান, চরিত্রাংকন, সংলাপ, ঘটনাকাল, লিখনরীতি এবং জগৎ ও জীবনের প্রতি বিশেষ একটি দৃষ্টিভংগী—এই ছয়টি উপাদানেই উপন্যাসের গঠন। অবশ্য অবিমিশ্র গল্পেব টানে উপন্যাস পড়েন, এমন লোকের সংখ্যা আজকেব দিনেও কম নয়। সদৃশ ব্যাপারের সংগে তুলনা কবলে বলতে হয়, এ অনেকটা কৃপণের অর্থ সঞ্চয়ের আগ্রহের মতো। পণ্য বস্তু লাভের জন্যই অর্থের প্রয়োজন। সে কথা বিস্মৃত হয়ে কৃপণ আত্মনিপীড়নের মূল্যেও অর্থ সঞ্চয় করে। তেমনি আখ্যান যে উপন্যাসের প্রাণ নয়, —একটি প্রয়োজনীয় অংগমাত্র, এই কথাটি ভুলে, একদল লোক আখ্যানের অতিপ্রাধান্যে আস্থা রাখেন। একটি গল্প বা একটি কবিতা যেমন, একটি উপন্যাসও তেমনি, বিভিন্ন অংগবান একটি প্রাণীর মতোই বিভিন্ন উপাদান-সম্ভূত ঐক্যবোধোদ্রেককারী। এই ঐক্যবোধ উদ্রিক্ত হয় আখ্যান ও চরিত্র, ভাব ও ভাষার সুসমঞ্জস সমন্বয়ে। 'আলালের

ঘরের দুলালে' আখ্যানও আছে, চরিত্র-বর্ণনও আছে, কিন্তু এই দুয়ের সমন্বয় সেখানে সার্থক নয়। এই সমন্বয়টি যখন সার্থক হয়, উপন্যাসও তখন উৎকৃষ্ট হয়। কোনো একটি চরিত্রের সম্ভাবনা অসীম হলেও তার পরিবর্তনের, তার ভিন্নপথগামীতার একটা সীমা পাঠকের মনে আঁকা থাকে। অতীতের সংগে বর্তমানের, এবং বর্তমানের সংগে ভবিষ্যতের যোগসূত্র এবং সামঞ্জস্য বজায় রেখে নিপুণ ঔপন্যাসিক তাঁর চরিত্র সৃষ্টি করেন। এই কথাটাই অন্যভাবে বলা যায় যে, আখ্যানের প্রয়োজনে চরিত্রের স্বভাব-পরিবর্তন অনুচিত। আখ্যান ও তদন্তর্গত চরিত্রের সমন্বয় সাধনেই সার্থকতা। এর অন্যথায় যা ঘটে, ইংরাজীতে তাকে বলা হয়, motivation। এ সম্বন্ধে ইংরাজ সমালোচক Hudson এর মত হয়েছে :

"In the evolution of plot out of character, the motives which prompt the persons of the story to act as they do must impress us as both in keeping with their natures and adequate to the resulting incidents."

নীতিমূলক বা didactic উপন্যাসের লেখকরা সাধারণতঃ এই "motivation"-এর আবর্তেই পথ হারান। বংকিম

চন্দ্রের রোহিনী বংকিমচন্দ্রের আদর্শবাদের তীক্ষ্ণাগ্র ফলকে প্রথম আহত হয়; গোবিন্দলাল সেই আহত শরীরে মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ-ও 'motivation'-জাত অপকর্ম্ম। 'আলালের ঘরের দুলাল'-ও এই দোষমুক্ত নয়। এবং এই দোষের জন্যই এই গ্রন্থের লেখক কতকগুলি 'টাইপ' চরিত্র সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বরদাপ্রসাদ বিশ্বাস এমনি একটি টাইপ; বাবুরাম বাবুব কনিষ্ঠ পুত্র রামলাল আর একটি টাইপ। বড়ো লোকের আদুরে ছেলে কুশিক্ষার ফলে উচ্ছন্ন যায়, বড়ো লোকের অন্য একটি ছেলে সুশিক্ষার ফলে মানুষ হয়ে ওঠে—এইটি চিত্রিত করাই মোটামুটি বইখানির উপজীব্য। প্রথমতঃ টেকচাঁদ ঠাকুর তাঁব বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়ে কুলীনের অত্যাচাব, বহু বিবাহের দোষ, দুষ্ট সন্তানের প্রতি মাতার প্রশ্রয়-প্রদানেব কুফল প্রভৃতি সমাজ-সংশোধক চিত্র লিপিবদ্ধ কবেছেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য সার্থক ও সফল করবার জন্য তাই বরদা-প্রসাদকে এবং রামলালকে অত্যন্ত সৎ এবং সাধু বেশে সজ্জিত করতে হয়েছে। ফলে রামলাল প্রায় নিষ্প্রাণ এবং বরদাবাবু হাস্যোদ্দীপক ভাবে অবিশ্বাস্য হয়ে উঠে-ছেন। অতিহীন শত্রু ঠকচাচার গ্রেপ্তারের সংবাদে

বেচারাম বাবুর মতো সজ্জনও আনন্দিত হলেন কিন্তু তখন 'বরদাবাবু স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।' তারপর যে মতিলালের চক্রান্তে তার কারাদণ্ড বা আরও গুরুতর শাস্তির কারণ ঘটেছিল, সেই মতিলালেব এবং ঠকচাচার পরিবারবর্গ বিপন্ন হলে তিনি বেচারামবাবুর মধ্যস্থতায় অর্থ সাহায্যের ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন, 'আপনারা আমার নাম না প্রকাশ করিয়া কোন কৌশলে এই টাকা পাঠাইয়া দিলে আমি বড় আপ্যায়িত হইব।' বরদাবাবুর মহত্ব দেবদুর্লভ। মানবসুলভ দুর্বলতা তাঁর কিছুই নেই। তিনি স্থির, প্রশান্ত, পবোপকারী ;—তিনি ধর্ম্মভীরু, কৃতবিদ্য, বহুদর্শী সুশিক্ষক। 'রামলাল ভাগ্যক্রমে বরদাবাবুর শিষ্য হইয়াছিল।' ফলে মতিলালের একটিও দুর্বলতা তার নেই। সে আদর্শ-চরিত্র যুবক। ঠকচাচাও একটী টাইপ-চরিত্র। কিন্তু ঠকচাচা প্রাণহীন নয়। এই বই-এর মধ্যে তাকেই বরং প্রধান আকর্ষণীয় ব্যক্তি বলে মনে হয়। গ্রন্থের শেযাংশে 'মাণিকযোড়ের' মত ঠকচাচা ও বাহুল্যকে যখন জাহাজে চড়ে দেশান্তরের বন্দীশালার উদ্দেশে যাত্রা করতে দেখা যায়, তখন তার শেষ উক্তিটিও প্রাণবান মানুষের উক্তি। সমস্ত জীবনের অপকর্ম্ম, খলতা, চক্রান্তের ইতিহাস স্মরণ করেও সে

অনুতপ্ত হয় না। বেচারার শেষ দুঃখ এই যে, তার ঘর গেছে, সংসার গেছে, স্ত্রীর সংগে বিদায়কালে সাক্ষাতও হল না,—তবু তার আশংকা যায়নি,—'মোর বড় ডর তেনা বি পেল্টে সাদি করে।' ঠকচাচা শয়তানী বুদ্ধির প্রতীক হলেও সাধুতার প্রতীক বরদাবাবু অথবা রাম-লালের মতো সে 'ফসিল' নয়। তার মধ্যে জীবনের বৈচিত্র্য আছে। এই বৈচিত্র্য লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন তার ভাষার বৈশিষ্ট্যে, স্ত্রীর প্রতি তাঁর দুর্বলতায়, পার্থিব লাভ-ক্ষতির প্রতি তার ঐকান্তিক সতর্কতায়। সে নীচ এবং ঘৃণ্য, তবু সে জীবন্ত! বেনীবাবু, বেচারাম বাবু, বক্রেশ্বর, বাঞ্ছারাম—এঁরা সকলেই বৈচিত্র্যহীন এক-দেশদর্শী অভিনেতা; কিন্তু ঠকচাচা অবিস্মরণীয় শয়তান। তাকে দেখে প্রাচীন বংগ-সাহিত্যের একটি সমধর্মী চরিত্রের কাহিনী মনে পড়ে,—চণ্ডীমংগলের ভাঁড়ু দত্ত।

'আলালের ঘরের দুলাল'-এর লিখন রীতি বা শৈলী সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। গদ্যরীতির এই অভিবনত্বের সমৃদ্ধি থাকলেও, এ বই-এ উপন্যাসের উপযোগী সংলাপের অভাব সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। নাটকের দৃশ্যপট শ্রোতৃমণ্ডলীর চোখের সামনেই থাকে। তাতে লেখকের পক্ষে কিছু অসুবিধা ঘটলেও, সংলাপ,

রচনার সুবিধাও সাধিত হয়। কিন্তু ঔপন্যাসিকের হাতে এদিকে স্বাধীনতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকলেও দায়িত্ব কিছু কম নয়, বরং বেশি। নাট্যকার তাঁর শ্রোতৃবৃন্দকে কান ছাড়া অপর যে ইন্দ্রিয়টির সাহায্য গ্রহণ করতে অধিকার বশতঃই অনুরোধ করতে পারেন, ঔপন্যাসিক তা পারেন না। ঔপন্যাসিকের হাতে তুলিও নেই, রংও নেই। শুধু শব্দে এবং বাক্যে, কথায় এবং কাব্যে, স্পষ্টোক্তিতে এবং ইংগিতে তাঁকে তাঁর কর্তব্য পালন করতে হয়। তাই উপন্যাসে নাটকের সংযম যেমন নেই, নাটকেও উপন্যাসের অবকাশ তেমনি নেই। এই অবকাশের মুক্তিকে প্যারীচাঁদ কাজে লাগাতে পারেন নি; ফলে বেচারাম বাবু অথবা বেণী বাবু, অথবা বক্রেশ্বর বাবু যখন কথা বলেন, তখন পাঠকের মানসপটে বক্তার কোনও চিত্রই ফুটে ওঠে না। মিত্র মহাশয় অবশ্য এদিকে প্রয়াসের ত্রুটি রাখেন নি। তিনি কোনো চরিত্রকে আনুনাসিক উচ্চারণের মুদ্রাদোষের দ্বারা প্রত্যক্ষ করতে চেষ্টা করেছেন, কখনও বা ব্যক্তিবিশেষের অস্বাভাবিক সংগীতপ্রীতির বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আলোচ্য বইখানির পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারেন যে, লেখকের উদ্দেশ্য বিশেষ সফল হয় নি। তাঁর প্রয়াস ফলপ্রসূ নয়।

প্রকৃতি-বর্ণনা প্যারীচাঁদের হাতে স্বল্প হলেও সুন্দর। তবে এ জাতীয় চিত্রও এই গ্রন্থে অপ্রত্যাশিত ভাবে সংক্ষিপ্ত। গাছপালা, নদীনালা, আকাশের ব্যাপ্তি, আলোর ঔজ্জ্বল্য, অন্ধকার রাত্রির একাকিত্ববোধ—এ সব এ বই-এ প্রায় অনুপস্থিত; তবে মাঝে মাঝে একটু-আধটু ছবির টুক্‌রো চোখে পড়ে :—মিয়াজান গাড়োয়ান দুঃসহ-ভারাবনত বৃষভযুগলের প্রতি ক্ষণেকের জন্য মনোযোগ দিয়ে একটি রাস্তার ছবি স্পষ্ট করে তোলে, বাবুরাম বাবুর নৌকাডুবির সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র হঠাৎ চোখে পড়ে, বর্ষণধৌত কলিকাতার একটি পথ এক মুহূর্তের জন্য দেখা যায়। কিন্তু এ ছাড়া এ রাজ্যে প্রকৃতির বিশেষ কোনও প্রভাব নেই। এখানে শুধু মানুষ,—হীন, কদর্য, কুটিল মানুষের ভিড়,—লোভী শিক্ষক, মিথ্যাবাদী অমাত্য, প্রবঞ্চক ব্যবহারজীবী, মাতাল বিচাবক—এবং তাদেরই বিচরণের পথে-পথে গাড়ী-পাল্কী, সহিস-কোচোয়ান, পাইক-পেয়াদার পীড়াকর উপস্থিতি। তবে জমিদারের সভা বর্ণনায় টেকচাঁদ ঠাকুর বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই কাহিনীটিতে বাবুবাম বাবুব সভাব যতোগুলি বর্ণনা আছে,—সেগুলি সবই নিখুঁত এবং সুনিপুণ।

আরও একটি কারণে এই বইখানির গুরুত্ব স্বীকার্য পরিহাস-রসিকতায় প্যারীচাঁদ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর পূর্বে বাংলা গদ্যে এমন সুন্দর হাস্যরস সৃজনের দক্ষতা আর কোনো লেখকেরই ছিল না। ব্রহ্মরঞ্জন কবিরাজ অথবা প্রেমনারায়ণ মজুমদারের মধ্যস্থতায় তিনি নির্মল হাস্যরসের অবতারণা করেছেন, এবং এই ক্ষমতার চরম প্রকাশ দেখা গেছে ঠকচাচার চরিত্র-বর্ণনায়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বাংলা সাহিত্যে সাধারণতঃ নারী-চরিত্রের উৎকর্ষ-ই চোখে পড়লেও এ বই-এ আমরা একটিও উল্লেখযোগ্য স্ত্রীলোকের দেখা পাই না। মতি-লালের মাতা, বিমাতা ও স্ত্রী, মোক্ষদা ও প্রমদা, ঠকচাচী প্রভৃতি এতোগুলি স্ত্রী-চরিত্রের অস্তিত্ব সত্ত্বেও 'আলালের ঘরের দুলালে' বিশেষ উল্লেখযোগ্য নারী একটিও নেই।

॥'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বললে হয়তো কিছু অতিশয়োক্তি ঘটে,—কিন্তু সে যাই হোক, বংকিম-শরৎ-রবীন্দ্রনাথের রচনায় সমৃদ্ধ বাংলা উপন্যাসের সূত্রপাত ঘটেছিল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই বইখানি দিয়েই। তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের ভাষা এবং বিষয়বস্তু এই দুয়েরই উন্নতি সাধনে রাধানাথ সিকদার এবং প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা'

(১৮৫৪) প্রচুর সাহায্য ক'রেছে। 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হবার পর বৎসর ঈশ্বর গুপ্ত দেহত্যাগ করেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের সাহিত্য- ক্ষেত্রে আবির্ভাব এবং ঈশ্বর গুপ্তের তিরোধানের মধ্যে অল্প দিনের ব্যবধান। কিন্তু এই দুই সাহিত্য-শিল্পীর কৃতিত্ব এক হিসাবে তুল্যমূল্য। প্যারীচাঁদ ছিলেন কৃতবিদ্য, ঈশ্বর গুপ্ত এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ নন। তবু এই দুই সাহিত্যসাধকের দৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্যের স্বরূপটি ধরা পড়েছিল। প্যারীচাঁদ গদ্যে যা করেছেন, ঈশ্বব গুপ্ত কবিতাব ক্ষেত্রে তারই অনুরূপ পরিবর্তন সাধিত করেছেন। প্যারীচাঁদ গদ্যকে সহজ এবং সর্বজনবোধ্য করে গড়ে তুলেছেন; ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর পূর্বযুগের ঐতিহ্য রক্ষা করেও কবিতাকে লৌকিক ভাব প্রকাশের বাহন করে তুলেছেন। মিত্র মহাশয়ের রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য-রসিকের দৃষ্টি প্রতিদিনের পরিচিত পরিমণ্ডলে অবতরণ করেছে। গুপ্ত-কবির রচনাতেও বিষয়বস্তুর এই সুখকর কৌলীন্যচ্যুতি দেখা গেছে। তাই প্যারীচাঁদের গ্রন্থ রচনার আজ প্রায় শতাব্দীকাল পরে 'আলালের ঘরের দুলাল'এর মূল্য-বিচার প্রসংগে 'প্রভাকর'-সম্পাদকের দানও একই সংগে মনে পড়ে।

বিহারীলালের কবিতা

ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলা সাহিত্যে রেনেশাঁস বা নবজাগরণ ঘটেছে, বলা যায়। বাংলা দেশের সর্বাংগীণ সংস্কারের কাল বলেই ইতিহাসে এই শতাব্দীটি সূচিত হবে। পূর্ববর্তী শতকের শেষ শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর। পৌরাণিক ধারায় আধুনিক সাহিত্য রচনায় অতি অস্ফুট প্রয়াস দেখা যায় তাঁর কাব্যে। তারপর প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে কবিগান, হাফ্-আখড়াই, যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতির প্রচারবাহুল্য। তারপর ঈশ্বর গুপ্ত, রংগলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল।

অষ্টাদশ শতকেও আমাদের কবিরা সাহিত্যের গতানুগতিক বিষয়বস্তু নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। ধর্মমংগল, শিবায়ন, কালিকামংগল, বৈষ্ণব পদাবলী, আধ্যাত্মিক সংগীত প্রভৃতি রচনাই তার নিদর্শন। কিন্তু নতুন যুগের প্রতীক্ষার কালও এই অষ্টাদশ শতাব্দী। এই প্রতীক্ষার ব্যাকুলতার চিহ্ন আছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। ভারতচন্দ্র-প্রদর্শিত আংগিকের বিচিত্র কৌশলে এই ব্যাকুলতারই

প্রকাশ এবং কবিওয়ালাদের ছন্দোস্বাচ্ছন্দ্য ভারতচন্দ্রেরই উত্তরসীমান্ত।

ঈশ্বর গুপ্ত কবিওয়ালাদের সমধর্মী এবং নিকট আত্মীয় হয়েও সহজ চোখে পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন; তবে তাঁর পৃথিবী বাংলা দেশেরই নামান্তর। দূর কাল এবং পরিব্যাপ্ত পৃথিবী তাঁর দৃষ্টি-পরিধির বহির্দেশে অলক্ষিত থেকে গেছে। কিন্তু সহজ চোখে পরিচিত পরিবেশ-দর্শনের সূত্রপাত তিনি করে গেছেন এবং এই জন্যই ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন কাব্যাদর্শ-সৃষ্টির পুরোধারূপে তিনি আমাদের নমস্য। রংগলাল এই সহজ দৃষ্টির সংগে স্বাধীনতা-প্রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বাংলা ভাষায় দেশ-প্রীতি-উদ্বুদ্ধ রাজনৈতিক কবিতা লিখে গেছেন। মধুসূদন ছিলেন প্রতিভাসম্পন্ন লেখক। তাই বাংলা কাব্যের ঐতিহ্য-প্রবাহে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের আন্দোলন সম্বন্ধে অবহিত থাকলেও তাঁকে প্রক্ষেপ মনে করাই স্বাভাবিক। আপন শক্তির বিপুলত্বে তিনি সমসাময়িক কবিকুলের নিকটবর্তী থেকেও বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন। ভাষায়, ভাবে, ছন্দে, কল্পনায়—মধুসূদন সর্বথা বিপ্লবী।

জন্ম-মৃত্যুর তারিখে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান লক্ষিত হলেও মোটামুটিভাবে কর্মজীবনে পূর্বোক্ত চারজন কবি ছিলেন

সমসাময়িক। কিন্তু বিহারীলালের সংগে মধুস্দনের বিশেষ সাদৃশ্য নেই। প্রকৃতিবাদ অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতি সহজ দৃষ্টিপাত রোম্যান্টিসিজম্‌-এর জনক। ইংরেজি সাহিত্যে এই প্রকৃতিবাদের লক্ষণ আছে James Thompson-এর রচনায়। 'রোম্যান্টিসিজম্‌' প্রকৃতিবাদ থেকেই বিবর্তিত হয়। রোম্যান্টিক কবির প্রকৃতিপ্রীতি আদর্শ-প্রীতির সংগে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। বোম্যান্টিক কবি নিকটবর্তী জগতের রূপে মুগ্ধ হন এবং দূববর্তী জগতের অদৃষ্ট সৌন্দর্য্য পিপাসায় ব্যাকুল হ'য়ে থাকেন। বিহারীলালের রচনায় প্রকৃতি-প্রীতি যতো আছে, ব্যাকুলতা ততো নেই। এই হিসাবে তিনি ঈশ্বর গুপ্তেরই উত্তরাধিকারী, মধুস্দনের অনাত্মীয়। মশা, মাছি, আনারস, তপসে মাছ, পাঁঠা, বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন ফল-ফুল এবং বংগীয় জনসাধারণের বিভিন্ন আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত কবিতা লিখে-ছিলেন। বিহারীলালও তাঁর পরিচিত এবং নিকটবর্তী জাতি, সমাজ এবং দেশকে সাহিত্যে অপাংক্তেয় করে রাখেন নি। মৃত বন্ধু এবং স্বর্গীয়া পত্নী, আশ্বিনের ঝড় এবং বাংলা দেশের নারী, হাওড়ার সেতু এবং নিমতলার শ্মশানের মধ্যবর্তী ভাগীবথী তীর,—এ সমস্তই তাঁর কাব্যের উপাদান রূপে নিয়োজিত। তথাপি তাঁর কাব্যে

সেই আশ্চর্য্য আর্তির প্রকাশ নেই—যা তাঁর পূর্ববর্তী বৈষ্ণব কবিদের হৃদয় হরণ করেছিল এবং যে আর্তি তাঁর পরবর্তী কবিকুলের পক্ষেও ছিল সমাদরণীয়। 'সারদা মঙ্গলে' বিহারীলাল বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর উপাসনা করেছেন, 'নিসর্গ সন্দর্শন' নামক কাব্যে প্রকৃতি-চিত্র এঁকেছেন, 'সাধের আসনে' স্থলে স্থলে আপন রোম্যান্টিক আকাংক্ষার সংবাদ দিয়েছেন; কিন্তু তাঁর কাব্যলোকে সেই অনাস্বাদিতপূর্ব দীপ্তির স্পর্শ লাগে নি, যা' 'never was on land or sea'। যেখানে তিনি রোম্যান্টিক আকাংক্ষার কথা লিখেছেন, সেখানে তাঁর রচনা সংবাদেব মতোই সাধারণ এবং বিস্মবণযোগ্য। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা এই ব্যাপারটি পরিস্ফুট হতে পারে। 'সঙ্গীত শতকেব' মধ্যে একটি গানে বিহারীলাল মানুষেব সম্বন্ধে তাঁর ঐকান্তিক প্রীতি এবং ব্যাকুলতার কথা লিখেছেন:—

"মানুষ আমার ভাই!
বড় প্রিয় ধন
মানুষ-মঙ্গল সদা
করি আকিঞ্চন।"...

পৃথিবীর যাবতীয় সাহিত্যের উপাদান দুটী ভিন্ন পদার্থকে অবলম্বন করেই গঠিত, এক—মানুষ; অন্যটী—প্রকৃতি।

রোম্যান্টিক-কবি-সম্প্রদায় এই দুই ভিন্ন বস্তুর প্রতি সমান আগ্রহশীল। তাঁরা মানুষের সংগে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথাই লিখে গেছেন এবং পরস্পরের প্রভাব ও উভয়ের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা, কল্পনা এবং আবেগে আন্দোলিত হয়েছেন। রোম্যান্টিক কাব্যের একটি বড় লক্ষণ হচ্ছে তার আবেগ-প্রবণতা। উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে কিন্তু কোনো আবেগের দোলা নেই। বাংলা কবিতার ইতিহাস আলোচনা কালে এই সংগীতটির কাছে এসে একবার যে থামতে হয়, তার কারণ ওর অন্তর্গত সংবাদটি। প্রকৃতি এবং মানুষ সম্বন্ধে কবি যে কৌতূহল ও প্রীতি অনুভব করেছেন, কেবলমাত্র এই সংবাদটী ঐতিহাসিকের চোখে মূল্যবান। প্রকৃতিবাদ এখনও 'রোম্যান্টিসিজম'-এ পর্যবসিত হয়নি, কিন্তু বিহারীলাল সেই পথেই যাত্রা করেছেন।

বিহারীলাল অর্ধালোকিত প্রত্যুষের কবি। তাই তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখী সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি এবং এর পরবর্তী আলোচনা অবলম্বন করে বিহারীলালের কবিতা সম্বন্ধে কিছু ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হয়েছে। বর্তমান প্রসংগে সে সম্বন্ধে কিছু

আলোচনা করা যেতে পারে। মধুসূদন বিহারীলালের সমসাময়িক কবি। তিনি পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বন করে 'যুদ্ধবর্ণনাসঙ্কুল মহাকাব্য' লিখেছিলেন সত্য, কিন্তু চতুর্দশ-পদী কবিতাবলীর মধ্যে তিনি 'নিভৃতে বসিয়া নিজের মনের কথা'ও বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং 'আধুনিক সাহিত্যের' অন্তর্গত আলোচনায় এ কথা তিনি স্বীকার করেছেন। তবু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে সমসাময়িক কবি-দের সংগে বিহারীলালের তুলনা তিনি করেননি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না—কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতার কবির নিজের সুর শুনিলাম।' যথার্থ ঐতিহাসিক আলোচনা করলে দেখা যাবে নবোন্মেষিত বাংলা কাব্যে সত্যকার 'ভোরের পাখি' ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। কবিওয়ালার উত্তরাধিকারী হয়েও তিনিই আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম লেখক। বিহারীলালের সম্পাদনায় 'অবোধ বন্ধু' নামে যে পত্রিকাখানি প্রকাশিত হতো, সেটি ছিল কবি-গুরুর বাল্যকালের চিত্তাকর্ষক সামগ্রী। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের 'পৌলবর্জিনী' নামক অনুবাদ রচনাটি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো এবং এই উপন্যাসটি কবির

অত্যন্ত ভাল লেগেছিলো। বিহারীলালের কবিতাবলীর সংগেও এই 'অবোধ বন্ধু'র মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়। বাল্যকালের প্রীতি সাধারণতঃ যুক্তি-তর্কের অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া সেই অপরিণত বয়সে পারিবারিক সম্পর্কের নৈকট্য বশতঃ বিহারীলালের প্রতি রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাত থাকা অস্বাভাবিক নয়। এই পারিবারিক সম্পর্কের কথা কবি তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'-তে লিপিবদ্ধ করে গেছেন :—

"বৌঠাকুরাণী এই কাব্যের মাধুর্যে (সারদামংগল) অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। ইহার অনেকটা অংশই তাঁহার একেবারে কণ্ঠস্থ ছিল। কবিকে প্রায় তিনি মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন এবং নিজ হাতে রচনা করিয়া তাঁহাকে একখানি আসন দিয়াছিলেন।"

(জীবন-স্মৃতি)

এই আসনের প্রাপ্তি স্বীকার করে বিহারীলাল তাঁর 'সাধের আসন' রচনা করেন।

সুতরাং বিহারীলালের কাব্যালোচনা প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের তুলনায় বিহারীলালের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারকালে সম্ভবতঃ তাঁর বাল্যস্মৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন,—একথা মনে কবা অসংগত হবে না।

বিহারীলালের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর বিষয়বস্তু চয়নের বৈশিষ্ট্যে, তাঁর প্রকাশভংগীর সারল্যে, তাঁর ছন্দের সাবলীলতায়, তাঁর প্রকৃতি-চৈতন্যে। বিষয়বস্তুর কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশভংগী সরল এবং শব্দ চয়নে তিনি স্থলে স্থলে বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পূর্বোক্ত রচনা থেকে এখানে আর একটু অংশ উল্লেখ করা অপ্রাসংগিক হবে না।

"বিহারীলালের ছন্দে মিলের এবং ভাষার দৈন্য নাই, তাহা প্রবহমান নির্ঝরের মতো সহজ সংগীতে অবিশ্রাম ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে। ভাষা স্থানে স্থানে সাধুতা পরিত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ অশিষ্ট এবং কর্ণপীড়ক হইয়াছে, ছন্দ অকারণে আপন বাঁধ ভাঙিয়া স্বেচ্ছাচাবী হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে কবির স্বেচ্ছাকৃত; অক্ষমতাজনিত নহে।"

সাবলীল ছন্দ ব্যবহারে বিহাবীলালের যেমন দক্ষতা ছিলো, মনোহর ভাষা ব্যবহারেও তাঁর তেমনি নৈপুণ্য ছিলো; কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর রচনার দুর্বলতা দেখে রবীন্দ্রনাথের উপরিউক্ত মন্তব্যের সার্থকতা এবং যাথার্থ সম্বন্ধে স্বভাবতঃই সন্দিগ্ধ হ'তে হয়।

তোমার হৃদয়ে তারে স্থাপন করিয়ে
প্রাণ যেন ফেটে যায় উঠিনু কাঁদিয়ে।

"মাগ ছেলে আমারে করিলি সমর্পণ
আমারে কাহারে দিলি ভাই রে এখন !"
—বন্ধুবিয়োগ—২য় সর্গ।

বিহারীলালের নিসর্গ-কবিতার আলোচনা প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ আর একটি প্রণিধানযোগ্য কথা লিখেছেন :—

"সাময়িক অন্য কবির রচনাতেও প্রকৃতিবর্ণনা আছে কিন্তু তাহা প্রথাসংগত বর্ণনা মাত্র, তাহা কেবল কবির কর্তব্য পালন। তাহার মধ্যে সেই সোনার কাঠি নাই যাহার স্পর্শে নিখিল প্রকৃতির অন্তরাত্মা সজীব ও সজাগ হইয়া আমাদিগকে নিবিড় প্রেমপাশে আবদ্ধ করে।"

তৎকালীন পাঠকের মনে বিহারীলালের প্রকৃতি-কাব্য কতো যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার সাক্ষ্য আছে রবীন্দ্রনাথের উপরিউক্ত মন্তব্যে। কিন্তু একালের পাঠক বিহারীলালের রচনায় নিখিল প্রকৃতির সজীব ও সজাগ অন্তরাত্মাকে ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র উপলব্ধি করেন। Shakespeare ইংরেজি সাহিত্যের এলিজাবেথীয় যুগের লেখক। কিন্তু তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাগুলি পড়বার সময় আজও সজীব, সতেজ, সদ্যোদৃষ্ট প্রকৃতি আমাদের সমস্ত চৈতন্যকে মোহাবিষ্ট করে। অর্থাৎ Shakespeareএর সাহিত্যে প্রকৃতি চিরন্তন মাধুর্য লাভ

করেছে। কালের কুটিল হস্তক্ষেপে সেখানে একটি ফুলও বিবর্ণ হয় না, একটি পাতাও ঝরে যায় না। কিন্তু বিহারীলাল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে যা সৃষ্টি করেছেন, বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নকালের পূর্বেই সে সৃষ্টি যাদুঘরের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। তার সংগে তুলনা করলে বরং মধুসূদনের প্রকৃতি-গাথা আমাদের অনেক বেশি অভিভূত করে। বিহারীলাল সহজ চোখে প্রকৃতিকে দেখেছেন বটে, কিন্তু তাঁর মোহাবেশ অত্যন্ত তরল। মধুসূদন অধিকাংশ স্থলে প্রকৃতিচিত্রণে অলংকারের বাহুল্য ঘটিয়েছেন এবং প্রাচীন রীতি রক্ষা করে (Convention) গেছেন, কিন্তু যেখানে তিনি স্বাধীনভাবে প্রকৃতির প্রতি আত্মচৈতন্যের প্রতিক্রিয়া ঘোষণা করেছেন, সেখানে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন, সেখানে তিনি নিঃসংগ। ‘কপোতাক্ষ নদ’ অথবা ‘বসন্তে একটি পাখীর প্রতি’ প্রভৃতি কবিতায় প্রকৃতি একটী সজীব হৃদয়ের কবোষ্ণ স্পর্শে সঞ্জীবিত ;—কবি-চিত্তের মাধুরীর সংমিশ্রণে মধুসূদনের প্রতিভা বাংলা ভাষার নব যুগে শ্রেষ্ঠ নিসর্গ-কবিতা রচনায় সমর্থ। পক্ষান্তরে বিহারীলাল কোনো কোনো স্থলে প্রকৃতি চিত্রাংকণে যথেষ্ট স্বাধীনতার পরিচয় দিতে পারেন নি, যেমন :—

"ভ্রমর ভ্রমরী ধরি গুন্ গুন্ তান
দুয়ে এক ফুলে বসি করে মধু পান।
কুরঙ্গিনী নিমীল-নয়না রস ভরে,
কৃষ্ণসার কণ্ঠে তার কণ্ডুয়ন করে।
মলয় অনিল বসি কুসুম দোলায়
সৌরভ-সুন্দরী কোলে, দোলে দু'জনায়।"

—প্রেম প্রবাহিণী, ২য় সর্গ।

তাঁর পৃথিবীতে কৃষ্ণসার আর কুরংগিনীর বিচরণ, চক্রবাক্ মিথুনের বিরহ-বেদনা, 'বিহ্বল হরিণী চমকি চমকি চায়।' তবে বিহারীলাল প্রধানতঃ স্বাধীনভাবেই প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন এবং কোনো কোনো জায়গায় এই সব দৃশ্য শুধু যে নয়নাভিরাম, তাই নয়, হৃদয়স্পর্শীও বটে। এমনি একটি দৃষ্টান্ত দেখি 'নিসর্গ সন্দর্শনের' দ্বিতীয় সর্গে। মহাসমুদ্রে অতি ক্ষুদ্র, জনহীন একটি ভাসমান দ্বীপের প্রসংগে তিনি লিখেছেন ঃ—

"কোনটি বা ফল-ফুলে অতি সুশোভন,
নন্দন কানন যেন স্বর্গে শোভা পায় ;
সম্ভোগে করিতে কিন্তু নাহি লোকজন
বিধবা-যৌবন যেন বিফলেতে যায় !"

ইংলণ্ডে ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের নব জাগরণের

অন্যতম পুরোধা Coleridge, 'Lyrical Ballads'-এর উদ্দেশ্য স্থাপন প্রসংগে লিখেছিলেন, 'To give the charm of novelty to things of every day.' বলা বাহুল্য, এই নীতি রোমান্টিক কবি মাত্রেরই পালনীয়। বিহারীলালের উপরিউদ্ধৃত অনুচ্ছেদে এবং অন্যান্য রচনায় এই কাব্যাদর্শেরই প্রকাশ। রোম্যান্টিক্ কবিদের স্বধর্মানুসারে বিহারীলাল আংশিকভাবে অজ্ঞাতের রহস্যামোদী ছিলেন। যেমন ঃ

"রহস্য বিশ্বের প্রাণ,
রহস্যই স্ফূর্তিমান,
রহস্যে বিরাজমান ভব।..." ইত্যাদি।

এই দৃষ্টান্তের দ্বারাও বিহারীলালের আবেগ-দৈন্য সূচিত হয়। এখানে তিনি যেন একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রচার করেছেন। পুরাণোল্লেখ-প্রীতি রোমান্টিক কবিদের অন্যতম বিশেষত্ব। আলোচ্য কবির রচনাতেও এ জাতীয় উল্লেখের বাহুল্য লক্ষিত হয়। যেমন ঃ—

ভূত ভাবী বর্তমানে
কত কথা জাগে প্রাণে,
জানকী অশোক বনে দেখেছে তোমায়

—শরৎকাল।

পুরাণোল্লেখ ব্যতীত প্রাচীন কবিদের রচনাংশ স্মরণও এই কবির অভ্যাস। বস্তুতঃ তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে কালিদাস, ভর্তৃহরি, শীহ্লনমিশ্র, ভবভূতি, ভারবি, হর্ষ প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের কবিকুলের পদাবলী এবং Shakespeare প্রভৃতি বৈদেশিক সাহিত্যিকের প্রভাব প্রচুর পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। 'সঙ্গীত-শতক' নামটির সংগেও সংস্কৃত শতকাখ্য গ্রন্থাবলীর নাম-সাদৃশ্য আছে।

বিহারীলালের আর একটি কৃতিত্ব এবং প্রশংসার বিষয় এই যে, তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক সমাজের দুঃখদৈন্য সম্বন্ধে সাহিত্য রচনাকালে অনবহিত থাকতেন না। দেশের রাজনৈতিক পরাধীনতায় তিনি কষ্ট পেয়েছেন। ঈশ্বর গুপ্তের মতো কোনো সংকীর্ণ অর্থে দেশাত্ম-বোধী তিনি ছিলেন না। এখানেও রোমান্টিক কবির গুণানুসারে তাঁর কাব্যের বিষয়-ব্যাপ্তি ঘটেছিলো। সমস্ত পৃথিবীর দুঃখ-দৈন্য-অন্যায়-অত্যাচারে তিনি উদ্বিগ্ন এবং ব্যথিত হতেন। এর প্রমাণ ঃ—

> "কলম্বস আবিষ্কৃত নূতন ভূভাগে,
> সভ্য প্রবঞ্চকদের পৌঁছিবার আগে
> আদিম নিবাসিগণ স্বচ্ছন্দে অক্লেশে,
> ভূমি স্বর্গ ভোগে ছিল আপনার দেশে।"

এবং আমেরিকার কথা ভাবতে ভাবতে তিনি স্বদেশের কথাও ভেবেছেন,

"আমাদের ভারতের শ্রেষ্ঠ সিংহাসন
কোথা হতে কোথা তার হয়েছে পতন!

প্রেম-প্রবাহিণী, ৫ম সর্গ।

এবং সমগ্র ভারতের কথা ভাবতে ভাবতে তিনি বাংলা দেশকেও ভুলে যান নি। 'বংগসুন্দরীর' মধ্যে বাংলার নারীর জন্য তাঁর সমবেদনা এবং সহানুভূতির সার্থক প্রকাশ দেখা যায়। তিনি বাংলা দেশের মেয়েদের আট ভাগে ভাগ করেছেন,

সুরবালা, চিরপরাধীনা,
করুণাসুন্দরী, বিষাদিনী,
প্রিয়সখা, বিরহিনী
প্রিয়তমা, অভাগিনী,
এই অষ্ট বংগ সীমন্তিনী।

বিহারীলাল প্রকৃতির কবি, পারিপার্শ্বিক দেশ-কাল সমাজ-সভ্যতার কবি—তিনি রহস্যাভিলাষী, স্বাধীনতা-লিপ্সু এবং কল্পনাপ্রবণ,—অধিকাংশক্ষেত্রে তিনি মিষ্টভাষী এবং ছন্দোপটু, তিনি বিদগ্ধ এবং পুরাণস্মর; তথাপি পূর্ণ-মাত্রায় রোমান্টিক তিনি হয়ে ওঠেন নি। ভারতচন্দ্র থেকে

তিনি অনেক দূরবর্তী কিন্তু মধুসূদনের মতো উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি পুরাণের নব্য সংস্করণ রচনায় ব্রতী হন নি—রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয় তাঁর অনেক পরে। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে বাংলা কবিতায় যে প্রকৃতিবাদের সূচনা হয়েছে বিহারীলাল সেই যুগের শেষাংশের অন্যতম প্রতিনিধি। তখন প্রকৃতিবাদের গুটিকা ভেদ করে বাংলা কবিতা 'রোম্যান্টিসিজ্‌মের' উজ্জ্বল, আশ্চর্য, দিগন্তহীন ব্যাপ্তির সামনে স্তম্ভিত হয়ে আছে—কখনো বা অস্ফুট স্বগতোক্তির দ্বারা তার অস্পষ্ট আত্মপ্রকাশ ঘটছে।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা

আদিকালে ধাতু এবং প্রস্তরের গলিত পিণ্ড যখন প্রথম ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ হ'লো, তখন এই ভূ-পৃষ্ঠ ছিলো রুক্ষ। সেই ইতস্ততঃ গহ্বরাকীর্ণ, অসমতল মাটির উপর দিয়ে কতো সুদীর্ঘ বর্ষণ, কতো প্রবল আলোড়ন এবং কতো প্রমত্ত ঝঞ্ঝার প্রবাহ চলে গেছে। তারপর একদিন সেই নিষ্প্রাণ বিস্তীর্ণ ধূসরতার উপর কোটি কোটি অংকুর উদ্গত হয়েছে,—বহুযোজনব্যাপী রিক্ততা ঢাকা পড়েছে মহারণ্যের শ্যামল আচ্ছাদনে!

বিংশ শতাব্দীর পাঠকের চোখে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা কিছু শিথিল, রুক্ষ এবং অসংযত। বনস্পতির আশ্রয় ছেড়ে ফিরে চলতে হয় উত্তপ্ত, বিক্ষুব্ধ ভূপৃষ্ঠের সেই আদিম চাঞ্চল্যে—যেখানে অশিষ্ট রিক্ততা এবং নির্লজ্জ উদ্ঘাটন, যেখানে পদে পদে প্রাণান্তকর বিদ্রূপ এবং প্রবল অট্টহাস্য। ঈশ্বর গুপ্ত সরল এবং অসংযতভাষী, আদিম এবং আধুনিক, —তাঁর আদিমতা তাঁর মন্তব্যে, আধুনিকতা তাঁর মননে।

আমাদের সাহিত্যে পূর্ব যুগের শেষ শক্তিমান কবি ছিলেন ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্র শব্দকুশল। কিন্তু শব্দের

ধ্বনির দিকেই তাঁর দৃষ্টি অতিনিবদ্ধ ছিলো ; ফলে কাব্যে অলৌকিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টির দুর্লভ গুণ থেকে তিনি বঞ্চিত। তিনি শক্তিমান বটে, কিন্তু মহৎ নন। কাব্যেব আত্মিক ক্ষেত্রে সহজপটুত্বের বহির্দেশে তাঁর বিশেষ গতিবিধি নেই, কিন্তু ধ্বনিবিন্যাসে এবং ধ্বনি-নিয়ন্ত্রণে তিনি যাদুকরের মতোই সাফল্য অর্জন করেছেন। বাংলা কবিতায় নতুন ছন্দের সম্ভাবনা-নির্দেশক হিসাবে পথিকৃৎ-এর সম্মান তাঁরই প্রাপ্য। এ বিষয়ে পরিশ্রমী শিল্পীর মনোভাব নিয়েই তিনি বহু পরীক্ষা করে গেছেন এবং তাঁর সেই সাফল্যের ভিত্তির উপরেই আধুনিক বাংলা কবিতার ছন্দোবৈচিত্র্য গড়ে উঠেছে। বিষয়-নির্বাচনে অপাত-দৃষ্টিতে তাঁকে নব ধর্মাবলম্বী বলে মনে হলেও দৃষ্টিভংগীতে ভারতচন্দ্র ছিলেন প্রাচীনপন্থী। সাহিত্যের আলোচনায় ভাব ও ভাষা, এই দ্বিবিধ পদার্থের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক যখন বিচার্য, তখন তাঁকে প্রাচীন যুগের কবি বলেই স্বীকার করতে হয়। অবশ্য ভারতচন্দ্রের সংগেই প্রাচীন যুগের অবসান ঘটেনি।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বর গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন এবং উনিশ বৎসর বয়সে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ‘সংবাদ প্রভাকরের’

সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্রের মৃত্যু থেকে 'সংবাদ প্রভাকরের' আবির্ভাবকাল পর্যন্ত প্রায় সত্তর বছরের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কবিগান, পাঁচালী, হাপ-আখড়াই প্রভৃতি রচনায় বাংলা দেশ সে সময়ে প্লাবিত ছিল। বৈষ্ণব পদাবলীর বহুল প্রচলিত ভাষা এইসব গানের মধ্যে কোনো কোনো স্থলে পুনর্ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বিষয়বস্তু ছিল ব্যক্তিগত গালিগালাজ, প্রসংগত তারই মাঝে মাঝে পুরাণোল্লেখ করা হতো। এইসব লেখক কাব্যের form বা বহির্গঠন এর প্রভূত অনুশীলন ক'রেছেন। অনুশীলনের ফলে পদ্য রচনা তাঁদের হাতে প্রাত্যহিক ব্যবহারের গদ্যের মতোই সহজ হ'য়ে গেছে। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের কবিওয়ালারা ভারত-চন্দ্রেরই স্বগোত্র এবং নিকট আত্মীয়। বাংলা কাব্যের বহিরংগ-সাধকের দল রচনা-নৈপুণ্যের প্রখরতায় তাঁদের সমসাময়িক পাঠক-সম্প্রদায়কে বিচলিত করে তুলেছিলেন। তাঁদের শারীরিক মৃত্যুর সংগে সংগে তাঁদের কীর্তিও প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। আধুনিককালে একমাত্র ঐতিহাসিক আলোচনা প্রসংগেই সেই সব রচনা স্মরণ করা হয়। সাহিত্যিক উৎকর্ষ সাধনের ফলে যে সংযম এবং অন্তর্দৃষ্টি

আবশ্যক, তা থেকে তাঁরা বঞ্চিত ছিলেন। হঠযোগীর নিরুদ্ধ প্রাণশক্তি যেমন স্বল্পলাভের চারিদিকেই আবর্তিত হতে থাকে, কবিওয়ালার ছন্দোনৈপুণ্যও তেমনি আপন প্রমত্ততা উত্তীর্ণ হয়ে কোনদিনই প্রশান্ত হতে পারে নি।

বাংলা সাহিত্যের এই বহু নিন্দিত ভাব-চাপল্যের যুগে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব। প্রাকৃতিক নিয়মেই তিনি তাঁর পূর্ববর্তী কবিসম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার-বন্ধন থেকে মুক্তি পান নি। তিনি নিজে কিছুকাল কবিগানের 'বাঁধনদার' বা রচয়িতা ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর একনিষ্ঠ সাহিত্যিক জীবনে একটি মুহূর্তের জন্যও তিনি এই প্রভাব থেকে মুক্তি পান নি। তাই চাপল্য এবং বহিরাড়ম্বর, অতিভাষণ এবং বিদ্রূপ গুপ্তকবির রচনার অচ্ছেদ্য অবয়ব। আর ছন্দোবন্ধে রচনা শিশুর ক্রীড়নকের মতোই তাঁর নিত্য-সহচর এবং সহজায়ত্ত ছিল। এজন্য অতি শৈশবাবস্থা থেকে তিনি পৃথিবীতে যা কিছু দেখেছেন, তারই উপর কিছু না কিছু লিখে গেছেন। বংকিমচন্দ্র তাই তাঁর জীবনী ও কাব্যালোচনা প্রসংগে ইংরেজ কবি পোপের উক্তিটি স্মরণ করেছেন,—"I lisped in numbers for the numbers came."। আনারস থেকে আরম্ভ করে ঈশ্বর পর্যন্ত যাবতীয় জড় এবং চেতন পদার্থ

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় স্থান পেয়েছে এবং রসিকতায় তিনি সকলের প্রতি সমান উদার। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর অনেক কবিতা আছে, কিন্তু ঈশ্বরের মহত্ব বা অনির্বচনীয়ত্বে তিনি ততো মুগ্ধ নন, যতো মুগ্ধ বাংলা অভিধানে ঈশ্বরের সমার্থবাচক শব্দের প্রাচুর্য দেখে। অনুপ্রাস সৃষ্টির মোহে তিনি নির্বিচারে ভাষার সকল স্তর থেকে শব্দাহরণে ব্রতী। ফলে, তাঁর গদ্য ও পদ্য দুই-ই গ্রাম্যতাদুষ্ট এবং ইংরাজি শব্দে কণ্টকিত। অনুপ্রাসের কিছু নমুনা দেওয়া যাক,—

স্ববলে এ বল তুমি, যখনি হরিবে
আমি তুমি বলাবলি, কে আর করিবে ?
আছি আমি আর আমি রহিব না মোলে।
যে তুমি সে তুমি রবে, আমি যাব চ'লে ॥

—এই কাব্যাংশটি 'প্রার্থনা' নামের একটি কবিতাব অন্তর্গত। কিন্তু এর মধ্যে না আছে ভক্তের সংযম এবং ভাবগাম্ভীর্য, না আছে প্রেমিকের উপাসনা। বাংলা বর্ণমালার কয়েকটি ধ্বনির আবৃত্তি এবং পুনরাবৃত্তির দিকেই কবির সমস্ত প্রয়াস নিবদ্ধ। Poetic license বা কবির সংরক্ষিত অধিকারের বলেই এখানে সাধু ভাষার ক্রিয়াপদের সংগে চলিত ভাষার ক্রিয়াপদের একপর্যায়ত্ব।

কিন্তু সংরক্ষিত অধিকার-লিপ্সা সকল ক্ষেত্রেই দুর্বলতা-প্রসূত। আর এক জায়গায় 'নির্গুণ ঈশ্বর' নামে একটি কবিতার সূচনায় তিনি লিখেছেন,

কাতর কিঙ্কর আমি তোমার সন্তান,
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান ॥
বার বার ডাকিতেছি কোথা ভগবান।
একবার তাহে তুমি নাহি দাও কান ॥

এবং (আর কয়েক চরণ পরে), যেহেতু ঈশ্বর 'মূক হ'য়ে একেবারে নীরব', সেজন্য এই 'কাতর কিঙ্কর' সরোষে বলেন,

'কহিতে না পার কথা, কি রাখিব নাম।
তুমি হে আমার বাবা হাবা আত্মারাম।'

বংকিমচন্দ্র লিখেছেন, 'রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃ-ভাবে দেখিয়া ভক্তি সাধিত করিয়াছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে। রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প।' কিন্তু ভক্তির আতিশয্যের জন্য পংগু কবিতাকে স্বীকার করে নেওয়া এবং মোটা অংকের পণের লোভে হাবা মেয়ের পাণিগ্রহণ করা একই রকম ভাগ্য-বিপর্যয় নয় -কি ? তবে বংকিমচন্দ্র ঈশ্বর-চন্দ্রের আধ্যাত্মিক কবিতাগুলির সত্তার প্রতি যে

প্রশংসাবাণী বর্ষণ করেছেন, তার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বোধ হয় গুপ্তকবির কোনো পাঠকই সন্দেহ পোষণ করবেন না।

শব্দচয়নে তাঁর উদারতার দৃষ্টান্ত সংখ্যাতীত বলা যায়। 'শরীর অনিত্য' নামক গুরুতত্ত্বের আলোচনা-কালে কবি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অনুপ্রাসদক্ষতা-না দেখিয়ে থাকতে পারেন নি।

'আমি মুখে আমি কই, ফলিতার্থ আমি কই
আমি যদি আমি নই, মিথ্যা সমুদয়।
দারাপুত্র পরিবার বল তবে কেবা কার
মোহযুক্ত এ সংসার ফক্কিকারময়।'

'কে আমি' শিরোনামায় আর একটি আধ্যাত্মিক আলোচনায় "নই হে," "রই হে," "কই হে," "হই হে," প্রভৃতি হে-অন্তিক চরণ ব্যবহারের পর যখন চোখে পড়ে,

লেগেছে বিষম ফাঁস, নিজ অস্ত্রে কাট পাশ,
আশাবাস কর নাশ, বলি পই পই হে।
এমন আর কে আছে, বলিব কাহার কাছে
আপনি তুলিয়া গাছে কেড়ে নিলে মই হে॥

তখন আত্মবোধের অসারত্ব সম্বন্ধে আমরা অবহিত হই বা না হই, কাব্যরস-বোধে একটি গুরু আঘাতের ফলে আমাদের সন্ত্রস্ত হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না।

আর একটি কবিতার কয়েক পংক্তি :—

ভারতের অধিশ্বরী মাতা মহারাজ্ঞী।
আহ্লাদ প্রকাশ হেতু আতোষের বাজী
ব্যাপিল পৃথিবীময়, শুভ সমাচার।…

বিহারীলালের কাব্যালোচনা প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ লিখে-ছিলেন,

'মিলের দুইটি প্রধান গুণ আছে, এক তাহা কর্ণ-তৃপ্তিকর, আর এক অভাবিতপূর্ব। অসম্পুর্ণ মিলে কর্ণের তৃপ্তি হয় না, সেটুকু মিলে স্বরের অক্ষমতা ও ভাষার দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। ক্রিয়াপদের মিল যত ইচ্ছা করা যাইতে পারে সেরূপ মিলে কর্ণে প্রত্যেকবার নূতন বিস্ময় উৎপাদন করেনা, এইজন্য তাহা বিরক্তিজনক ও একঘেয়ে হইয়া উঠে। বিহারীলালের ছন্দে মিলের এবং ভাষার দৈন্য নাই। তাহা প্রবহমান নির্ঝরের মত সহজ সংগীতে অবিশ্রাম ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে। ভাষা স্থানে স্থানে সাধুতা পরিত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ অশিষ্ট এবং কর্ণ-পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহা কবির স্বেচ্ছাকৃত, অক্ষমতাজনিত নহে।'

ব্যাকরণ-দুষ্ট, অশিষ্ট শব্দের পৌনঃপুনিক প্রয়োগ হয়তো গুপ্ত কবির পক্ষেও স্বেচ্ছাকৃত। কিন্তু 'অভাবিতপূর্ব'

শব্দপ্রয়োগ তাঁর কাব্যে কখনোই অপূর্ব বিস্ময়োদ্রেক করে না,—পক্ষান্তরে, (অন্ততঃ এ যুগের) পাঠকের কর্ণের অতৃপ্তিই সাধন করে। বরং ঈশ্বর গুপ্তের উপমার সারল্যেই আমরা ক্ষণে ক্ষণে মুগ্ধ হই। একটি সম্পূর্ণ কবিতা,—

সাধু

রাগ নাই, দ্বেষ নাই, নাই কোন দোষ।
সোনা আর ধূলি লাভে সম পরিতোষ॥
কোনরূপে নাহি রাখে, কিছু অভিমান।
সমভাবে দেখে সব আপন সমান॥
অন্তরে ঈশ্বর চিন্তা, মুখে প্রেম রস।
সাধু সাধু সাধু সেই গাই তার যশ॥
সাধু সাধু সাধু রব অনেকেই কয়।
ফলে সে সরল সাধু, অনেকেই নয়॥
যেমন পোস্তের ফুল, সাদা সমুদয়।
কদাচিৎ দুই এক রক্তবর্ণ হয়।

এই ছোট কবিতার শেষ চরণ দুটিতে এসে তবু যা'হোক একবার আরামের দীর্ঘশ্বাস ফেলা যায়। বদ্ধ ইমারতের অন্ধকার কামরায় এ যেন হঠাৎ আগন্তুক এক ঝলক বে-আইনি বাতাস। এই তো অপ্রত্যাশিত! এইখানেই তো বিস্ময়! ঈশ্বর গুপ্তের আধুনিকত্বের দাবীও এইখানে।

তাঁর পূর্ব যুগের কৃত্রিমতা থেকে এমনি ক্ষণে ক্ষণে তিনি নেমে আসেন অতি পরিচিত মাটিতে,—চেনা ফুল-ফলের ক্ষেত্রে। অশোভন উপমা, দুষ্ট রুচি এবং অশিষ্ট শব্দের আবর্ত তাঁকে বন্দী করেছে, কিন্তু তাঁর বক্তব্য হচ্ছে আমাদের অতি পরিচিত, অতি নিকটবর্তী পৃথিবীর সংগে ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কিত। কথা বলার প্রথম অস্ফুট প্রয়াসের সময় নতুন একটি খেলা মনে পড়লে শিশু যেমন কথার প্রতি মনোযোগ কমিয়ে খেলাকেই প্রধান আকর্ষণের বিষয় মনে করে, গুপ্তকবি তেমনি তাঁর কাব্যরচনাক্ষেত্রে বর্ণনার কাছে বক্তব্যকে ছোট করে ফেলেছেন। মননের আড়ম্বরের পাশে তাঁর মন্তব্য অত্যন্ত ম্লান মনে হয়। অথচ তিনিই নব যুগের প্রথম বাঙালি কবি, যাঁর কাব্যে সমসাময়িক সমাজের বাস্তব বর্ণনা প্রধান স্থান অধিকার করেছে। প্রাক্-আধুনিক যুগে ভারতচন্দ্র অবশ্য এদিকে কিছু সাফল্য অর্জন করেছিলেন এবং তারও পূর্বে বিভিন্ন মংগলকাব্যের একাধিক লেখক এ বিষয়ে অল্প-বিস্তর কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। কিন্তু খণ্ডকাব্যের মাধ্যমে সমসাময়িক ব্যক্তি ও সমাজের বহুল চিত্রাংকন ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ববর্তী অন্য কোনো বাঙালি কবির পক্ষেই সম্ভব হয়নি। প্রতিভার নির্ভীকতা তাঁর ছিল, এবং সেই সংগে

কিছু নির্লজ্জতা থেকেও তিনি মুক্ত হননি। রুচিবিকার তখনকার যুগধর্ম; আর বিদ্রূপ এবং হাস্যরস বণ্টনেই ছিল ঈশ্বর গুপ্তের আন্তরিক ঝোঁক। এবং সকলেই জানেন, প্রাচীন বংগ-সাহিত্যে হাস্যরস মানেই ভাঁড়ামি।

বংকিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তকে বলেছেন, খাঁটি বাঙালি কবি। বাংলা দেশের ফুল-ফল, স্ত্রী-পুরুষ, উৎসব আন্দোলন,—বাংলাদেশের ঋতুর ঐশ্বর্য এবং প্রকৃতির বিপুলতা তাঁর লেখনীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সমাজকে তিনি ভালোবেসেছেন, দেশকে তিনি হৃদয় দিয়ে চিনেছেন। তাঁর বিদ্রূপে তাই ঝাঁজ নেই, হাসিতে নেই হুল। পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে এদেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার তাঁর ভাল লাগেনি। বিধবা-বিবাহের কথা উল্লেখ করে বিদ্রূপ-হাস্য সহকারে তিনি বাব বার বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করেছেন। হিন্দুর ছেলে বেদ-কোরাণের ভেদ মানে না দেখে তিনি শংকাগ্রস্ত হয়েছিলেন।

একদিকে যুদ্ধবিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে তিনি ব্রিটিশ সিংহের শৌর্যের প্রশংসা করেছেন, অন্যদিকে আবার মার্শম্যান্ সাহেবের উদ্দেশে লিখেছেন,—

> ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া বৃষভে আরোহণ
> অহঙ্কার অলঙ্কার ভুজঙ্গ ভূষণ

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা

পক্ষপাত হাড়মালা সদা সুশোভন
মিথ্যাছল তোষামোদী ত্রিশূল ধারণ ॥

ছদ্ম মিশনারির বর্ণনা প্রসংগে তিনিই লিখেছিলেন,

বিদ্যা দান ছল করি মিশনরি ভব
পাতিয়াছে ভাল এক বিধর্মের টব।

নীলকর সাহেবের অত্যাচার উল্লেখ করে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশে ঈশ্বর গুপ্তের নিম্নোক্ত কাব্যাংশ এখনো বহু কণ্ঠে ধ্বনিত হয় :

তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি সিং বাঁকানো
কেবল খাবো খোল বিচিলি ঘাস ॥
যেন রাঙ্গা আমলা তুলে গামলা
গামলা ভাঙ্গে না
আমরা ভুসি পেলেই খুসী হব
ঘুসি খেলে বাঁচব না ॥

কবিওয়ালা রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু একবার বলেছিলেন,

নানান্ দেশের নানান্ ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা ?

তার অনতিকাল পরে বাংলাভাষার সেই দুঃখ-কাতর

দুর্দিনে দেশপ্রেমিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও স্বদেশের ভাষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ব্যক্ত করেছেন,

হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ
দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ।

দেশীয় পত্রের ইংরেজ সম্পাদকের পরিচয় তাঁর রচনাবলীর মধ্যে সঞ্চিত আছে।

বাহিরেতে ধোপদস্ত ধপধপে সাদা
ভিতরেতে ঘিন ঘিন পাঁক ভরা কাদা।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে আজ আমরা প্রধানতঃ তাঁর লঘু, হাস্যরসাত্মক কবিতাগুলির মধ্য দিয়েই স্মরণ করে থাকি। 'তপ্সে মাছ,' 'পাঁটা' এবং 'আনারস',—'হেমন্তের বিবিধ খাদ্য' এবং 'পৌষপার্ব্বণ',—'বিবিজান চলে যান লবেজান করে', 'বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে' প্রভৃতি প্রবাদতুল্য উক্তি,—এই সবের সমাবেশের মধ্য দিয়ে আজ মনের পটে তাঁর একটি রেখাচিত্র ফুটে ওঠে। কিন্তু একথা আজ আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, রংগালাপের সংগে সংগে গভীর দুঃখে তিনিই বলেছিলেন, "এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ"। যুগসন্ধির উন্মত্ত সূচনায় তাঁর আবির্ভাব, তাঁর চারিদিকের সমাজ তখনো সুশৃংখল নয়,—দেশের জীবনযাত্রাপ্রণালী শিথিল,—

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সে একটা অপরূপ মিশ্রণের কাল। তখন মাটিতে রস নেই, বৈদেশিক সূর্যের দাহ এবং স্বদেশী আলস্যের জড়িমায় থেকে থেকে বিরোধ বাধে, অভ্যস্ত ভারকেন্দ্র থেকে জীবন বিচ্যুত হয়ে যায়। বহুধা অত্যাচারে কণ্টকিত দেশে বাঙালি তখন বৃথাই তার ছায়া-সুনিবিড় শান্তিনীড়ের পথ খোঁজে। সেই অনুর্বর মরু-প্রান্তরে ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম তরুপদবাচ্য। সেখান থেকে আধুনিক বাংলা কাব্যের পায়ে চলা শীর্ণ পথ এগিয়েছে দুঃসাহসিক অভিযানে। সেখানকার মাটিতে মালিন্য, কিন্তু বাতাসে সুদূর মহাটবীর ঘ্রাণ!

বাংলায় স্বাধীনতার কবিতা

কাব্যসৃষ্টি শক্তির অলৌকিকত্বে যাঁদের আস্থা নেই, তাঁরাও স্বীকার করেন যে, শক্তিমান কবি অপূর্ববস্তুনির্মাণ-ক্ষমা প্রজ্ঞার দ্বারা সাধারণের অভাবিতপূর্ব উপায়ে চিত্তা-কর্ষক কথা রচনায় সিদ্ধহস্ত। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রখ্যাত আলংকারিকেরা বলেছেন, এর নাম রীতি। রীতি, মানে পদ রচনার বিশিষ্ট ভংগী। আধুনিক ইংরেজী কবিতার একজন সংকলয়িতা বলেছেন, Though it is true that the best poets in any age are those who are most successful in finding an idiom close enough to the world in which they live, it is also true that the poetical progress of an age can only be represented by those poets whose work is a genuine development of what has gone before." একটি বিশেষ যুগের বিশেষ idiom যাঁর আয়ত্ত, ভাব-প্রকাশে তাঁর আর কোন বাধা থাকে না। এই idiom অবশ্য কাব্য-ক্ষেত্রের idiom, সংসার-ক্ষেত্রের নয়। কাব্য-ক্ষেত্র এবং সংসারক্ষেত্র তাই বলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়।

সংসারক্ষেত্রের ভিত্তিতেই কাব্যজগতের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু তার সুদূরচারী নভোমণ্ডল নিত্য-পরিচিত সংসারের স্থুল পদাংকে চিহ্নিত হয় না। ভারতচন্দ্র তাঁর সমসাময়িক পাঠকের মনোহরণে যে সমর্থ হয়েছিলেন, তার কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা দেশের সাহিত্যিক idiom তাঁর করতলগত ছিল।

মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য প্রধানতঃ আখ্যান-বর্ণনধর্মী। বৈষ্ণব পদাবলী ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই বর্ণনার প্রাচুর্য চোখে পড়ে; এবং এই শ্রেণীর বর্ণনমূলক রচনায় যেহেতু কাব্যিক মননের অধিক অবকাশ নেই, সেই কারণে, বাংলা মংগলকাব্য অথবা বাংলা রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতে কাব্যের যথোচিত সূক্ষ্মতা অনুপস্থিত। এই ঐতিহ্যেই ভারত-চন্দ্র লালিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে প্রায় মধুসূদন দত্ত পর্যন্ত এরই ঢেউ এসে আমাদের কাব্যসাহিত্যের তটপ্রান্তদেশ স্পর্শ করেছে। মধুসূদন কাব্যের আংগিক নিয়ন্ত্রণে যে পরি-মাণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তার ভাববস্তুর সংস্কার মোচনে ঠিক সে পরিমাণ শক্তির প্রমাণ রেখে যান নি। সংস্কৃতের আলংকারিকেরা যাকে বলেছেন 'সিদ্ধরস', তাঁর মেঘনাদ-বধ কাব্যে সেই বস্তুর অসদ্ভাব ঘটেছে। কিন্তু কাব্যের বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব তাকে বলা যায় না। পৌরাণিক

কাহিনী অবলম্বন করে তিনি যা' লিখেছেন, তাতে সহজ, সাধারণ মানুষের মন স্ফটিক-দীপ্তিতে কোথাও বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে অবশ্য আমাদের সংসারের কাছাকাছি, ঘনিষ্ঠ ভাবলোক রূপায়িত হয়েছে, কিন্তু আঁটসাঁট চতুর্দশপদের শৃংখলের মধ্যে উদ্বেল সমুদ্রের কতোটুকুই বা ধরা যায়? আখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি ছাড়াও ছন্দে বাঁধবাব মতো আরো এক জগতের সন্ধান পেয়েছিলেন বিহারীলাল। বিহারীলাল চক্রবর্তীর পূর্বে আমাদের কবিদের বাসনা অপৌবাণিক, কীর্তিলেশহীন, সহজ মানুষের অন্তর্মুখী কল্পনার অভিমুখে বিশেষ উদ্রিক্ত হতে পারেনি, এ অভিমত শুদ্ধচিত্তেই পোষণ করা যায়। বিহারীলাল এ পথেব প্রথম পথিক, তাঁকে পথ আবিষ্কার এবং নির্মাণ—দুই-ই করতে হয়েছে। তখন থেকে বাংলা কাব্যেব প্রবাহ যে পথে চলেছে, সে পথ স্থূল সংসাবের বস্তুবতার মধ্যবর্তী নিষ্কলংক রজতস্রোতের সংগে তুলনীয়। অথবা, অন্য উপমার সাহায্য নিলে বলা যায় যে, এব পূর্ববর্তী কাব্যলোকে ক্ষিতি—অপ্—তেজ, এই ত্রিবিধ বস্তুর সৃষ্টি হয়েছিল,—ছিল না কেবল মরুৎ এবং ব্যোম্। এই দুটি সূক্ষ্মতর পদার্থ উত্তরকালের সামগ্রী।

ঈশ্বর গুপ্ত পারিপার্শ্বিক মানব-সংসারের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করেছিলেন বটে, কিন্তু মরুৎ-ব্যোমের বাসনা তাঁর ছিল না। কবিগানেব অন্যতম রচয়িতা এবং পৃষ্ঠ-পোষক হয়েও সমসাময়িক সমাজের অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ভাবলোকের পরিচয় তিনি মাঝে মাঝে পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সমগ্র রচনাবলীব তুলনায় এ ধরণের দৃষ্টান্ত আয়তনে নগণ্য। লঘু হাস্য-পরিহাস, গ্রাম্য কৌতুক-প্রবণতা এবং সর্বগ্রাসী শব্দপ্রীতি,—এই ছিল গুপ্ত-কবির বিশেষত্ব।

রংগলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বর গুপ্তেরই জ্ঞাতিস্থানীয়। বয়সে তিনি গুপ্ত কবির তুলনায় প্রায় পনেরো বছরের ছোট ছিলেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। কিন্তু সাহিত্যিক প্রবণতার বিচারে ঈশ্বর গুপ্তের এতো নিকটবর্তী কবি বোধহয় বাংলা সাহিত্যে আর কেউ নেই। ঈশ্বর গুপ্ত আধ্যাত্মিক কবিতাবলীও লিখেছিলেন, কিন্তু তাঁর কাব্যের বিশেষ প্রিয় বিষয় ছিল সমসাময়িক সমাজ। আর Parsons যেমন বলেছেন—"the Poetical progress of an age can only be represented by those poets whose work is a genuine development of what has gone before"—ঈশ্বর গুপ্ত সে রকম বিচারেও উত্তীর্ণ

হবেন, কারণ তাঁর পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক কবিওয়ালাদের তিনি ছিলেন স্বগোত্র। যেমন ঈশ্বর গুপ্ত, তেমনি রংগলালও কবিগান রচনা করেছেন। এঁরা দুজনেই তাঁদের জীবনকালে ঐতিহ্যাশ্রয়ী, আধুনিক কবি হিসেবে সম্মান পেয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকাল ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ স্বীকৃতির যুগ। যে রাজনৈতিক চৈতন্য বংকিমচন্দ্রের রচনাবলীতে প্রকাশিত, তার ক্ষীণ সূচনামাত্র তাঁর পূর্বকালীন বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়। শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশ প্রভুত্বের প্রতি অনির্বচনীয় শ্রদ্ধাবোধই ছিল কবিদের বৈশিষ্ট্য। সমসাময়িক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ঈশ্বর গুপ্তের যে আন্তরিক সম্মতি ছিলনা, তার প্রমাণ আছে তাঁর একাধিক কবিতায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'ভারত-সন্তানের প্রতি', - এই শিরোনামায় রচিত তাঁর একটি চতুর্দশপদী কবিতার উল্লেখ করা যায়। তার প্রথম কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃত হলো :—

পরাধীন ভারতের প্রিয় পুত্র যত।
ভ্রান্তিরূপ নিদ্রাবশে রবে আর কত॥
ক্রমেতে হইল শূন্য সুখের কলস।
এখন হরিছ কাল হইয়া অলস॥

উঠ উঠ শয্যা ছাড় শুয়ে কেন আর।
বাহিরেতে কি হয়েছে দেখ একবার॥

কিন্তু 'বাহিরেতে' তখনো বিশেষ কিছুই হয়নি। সিপাহী-বিদ্রোহের মতো ঘটনাতেও বাংলা কবিতার শান্তিকুঞ্জ অন্ততঃ ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুকাল অবধি অনুপক্রুত ছিল। তাঁর "যুদ্ধবিষয়ক কবিতাবলী"তে এর প্রমাণ আছে। ব্রিটিশ সংস্কৃতির প্রতি যে অসীম শ্রদ্ধাবোধে মধুসূদন দত্ত সর্বাংগীন ইংরেজ হবার বিফল সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সেই শ্রদ্ধাবোধের অভাববশতঃ অকৃপণ আত্ম-নিন্দায় ঈশ্বর গুপ্তেব ক্লান্তি ছিল না। বিশ্বাস করা শক্ত, যে, উল্লিখিত পংক্তিকয়েকটি যাঁর রচনাভুক্ত, নিম্নবর্তী কাব্যাংশও তাঁরই ;

ভারতের অবোধ দুর্বল লোক যত।
ডাল ভাত মাছ খেয়ে নিদ্রা যাবে কত?
পেটে খেলে পিঠে সয় এই বাক্য ধর।
রাজার সাহায্য হেতু রণসজ্জা কর॥

প্রাচীন যুগের স্বাধীনতাবোধ সম্বন্ধে John Stuart Mill লিখেছেন, "By liberty was meant protection against the tyranny of the political rulers." ঐ রচনারই কয়েক পংক্তি পরে তিনি আবার বলেছেন,

"Their power was regarded as necessary but also as highly dangerous." * । ঈশ্বর গুপ্তের 'স্বাধীনতা'র অর্থ হলো,—ব্রিটিশ ছত্রচ্ছায়ায় অত্যাচারহীন আশ্রয়। সুতরাং সমসাময়িক সমাজব্যবস্থায় তাঁর অসন্তোষের সততা স্বীকৃত হলেও মধ্যযুগের মংগলকাব্যের স্তর থেকে তাঁর রচনায় রাজনৈতিক স্বাধীনতাবোধের বিশেষ স্ফুরণ যে হয় নি, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। চণ্ডীমংগলে, ধর্মমংগলে, নাথগীতিকার কোনো কোনো স্থলে এবং প্রাচীন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বহু স্থানে রাজার ও প্রজার কর্তব্য অথবা প্রজার ন্যায়সংগত দাবীদাওয়া—ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন কবির মন্তব্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। খনার বচনে সর্ব সাধারণের যাতে উপকার হয়, এমন কাজেব অনুষ্ঠানে মনোনিবেশ করবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেশাত্মবোধের মধ্যে যে তীব্রতা ও অনৌদার্য, যে পরসম্প্রদায়বিদ্বেষী আত্মকেন্দ্রিকতার সম্ভাবনা আছে, এ সব রচনায় তা অনুপস্থিত। "Rule Britannia Rule the Waves"—ঠিক এই শ্রেণীর চূড়ান্ত স্বার্থপরতা অবশ্য বাংলা কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে কোনদিনই

---

* On Liberty—Mill

পারেনি। বংকিমচন্দ্র যে স্বাধীনতার কামনা অন্তরে পোষণ করতেন, সে হচ্ছে পূর্ব-পশ্চিমের সমবায়ে জাত এক সংস্কৃতির ভূমিকায় মানুষ মাত্রেরই ব্যক্তিত্বের স্ফুরণোপ-যোগী রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা।

পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্বাধীনতার অন্যতম কবি বলে নাম করেছিলেন। কিন্তু তাঁর রচনাবলীতেও শাসক বা অন্য কোন শ্রেণীর প্রতি শাসিত ভারতবর্ষের তীব্র বিদ্বেষ প্রকাশিত হয় নি। নিজের দেশ সে কাব্যে বরণীয় হয়ে উঠেছে, কিন্তু পরের দেশ মানচিত্র থেকে মুছে ফেলবার উপদেশ দেওয়া হয়নি। আর, রবীন্দ্র-নাথের বিশ্বভারতীর তোরণের লিপি উজ্জ্বল হয়ে আছে,—"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ং।" তাঁর 'স্বদেশ' নামক গ্রন্থভুক্ত একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :—

"পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা, তাহাই পোলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি—এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধ-বন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা ইহাই ধর্ম-নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি। য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা বিরোধ-মূলক ;

ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক।”

বস্তুতঃ রাষ্ট্রিক স্বাধীনতাবোধ বাংলাদেশের, তথা ভারতবর্ষের একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সামগ্রী। রবীন্দ্রনাথ অন্য একটি প্রবন্ধে লিখেছেন,—

“‘নেশন’ শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল মহত্বকে আমরা অত্যধিক আদর দিতে শিখিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ—আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। য়ুরোপ স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয়, আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানি না।”

রবীন্দ্রনাথের ‘Nationalism’ প্রবন্ধে এবং অন্যান্য বহু রচনায় অনুরূপ মত প্রচারিত হয়েছে। তাঁর ‘ভারততীর্থ’ সমস্ত জাতিধর্মের মিলনক্ষেত্র; তাই ভারতবর্ষকে তিনি তীর্থক্ষেত্র বলেছেন।

বাংলা কবিতার বিষয়বস্তু হিসাবে পাশ্চাত্য অর্থের স্বাধীনতাবোধ কেন যে দেখা দিতে পারেনি, তার কারণ লক্ষ্য করা গেল। ঈশ্বরগুপ্তের রচনায় পরাধীনতার অসন্তোষ এবং রাজশক্তির প্রশস্তি,—দুই-ই আছে।

বাংলায় স্বাধীনতার কবিতা

বংকিমচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল-রবীন্দ্রনাথের রচনায় বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষ উদার সমন্বয়ের ক্ষেত্র হিসাবে আধ্যাত্মিক মালভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। তথাপি পণ্ডিতসমাজে একটি সুপ্রচলিত মত হচ্ছে এই যে, রংগলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় প্রথম স্বাধীনতার কবিতা লিখে গেছেন। এই উক্তির সংগে সংগে রংগলালের একটি কবিতার যে অংশ প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হয়, সেটি স্কুল-কলেজের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত এবং প্রায় সমস্ত শিক্ষিত বাঙালিরই কণ্ঠে-কণ্ঠে ধ্বনিত।

> স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
> কে বাঁচিতে চায় ?
> দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
> কে পরিবে পায়।

এই উদ্ধৃতিটি কোন্ বাঙালি ছাত্রেরই বা অবিদিত ? এর পূর্ব প্রসংগ বা ভূমিকাটি স্মরণ করলে রংগলালের দৃষ্টিকোণ সম্যক বোঝা যাবে। 'পদ্মিনী-উপাখ্যানের' ভূমিকায় লিখিত রংগলালের একটি উক্তি এই প্রসংগে স্মরণীয় ঃ—

"ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্ধানকালাবধি বর্তমান সময় পর্যন্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই

নির্দিষ্টকালমধ্যে এ দেশের পূর্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজপুতনা দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণালংকারে রাজপুতেরা যেরূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, বিদুষীত্ব এবং সাহসিকত্ব গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্যপাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বন পূর্বক মৎকর্তৃক রচিত হইল।"

উল্লিখিত কাব্যাংশ এই 'পদ্মিনী-উপাখ্যানেব অন্তর্গত।' ভীমসিংহ পাঠানদের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের যখন উত্তেজিত করেন, তাঁর তখনকার উক্তি হিসাবে ছন্দোবদ্ধ ঐ কথাগুলি বংগলাল বসিয়ে দিয়েছেন।

অধ্যাপক Gilchrist সাহেব দীর্ঘকাল পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Nationality' সম্বন্ধে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "A Nationality lives either because it has been a nation, with its own territory and state, or because it wishes to become a nation with its own territory and state."

বাংলায় স্বাধীনতার কবিতা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রবল ভাবে উত্তেজিত হবার উপযুক্ত অবস্থা যখন ঘটেনি, সেই সময়ে বাংলার কাব্যক্ষেত্রে রংগলালের আবির্ভাব। কাজেই স্বাধীনতার কথা বলতে গিয়ে তাকে অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হয়েছে।

আর রংগলালের কাব্যে স্বাধীনতাবোধ যে ভাবে রূপায়িত হয়েছে, তা' ঈশ্বর গুপ্তের রীতি অনুযায়ী পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসকের মনোরঞ্জন বিধানের পরামর্শ নয়, দ্বিজেন্দ্রলালের অথবা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবের মিলন-ভূমি প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক আগ্রহও নয়,—সে স্বাধীনতাবোধ হিংস্র এবং নির্ভীক। বংকিমচন্দ্র সমন্বয়ের এবং মিলনের কথা লিখলেও তাঁর রচনায় বরং এই জাতের ঝাজ ছিল। তাঁর ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ, তাই সে রচনার একদিকে যবন-বিদ্বেষ, অন্যদিকে ইংরেজের প্রতিরোধ-কামনা। রংগলালের কাব্যে যবন-বিদ্বেষ ফুটেছে বটে, কিন্তু ইংরেজের জন্য তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন নন। ইংরেজি সাহিত্যের তিনি বিশেষ অনুরক্ত পাঠক ছিলেন। ইংরেজি আদর্শে কাব্য রচনার ইচ্ছা তিনি সর্বান্তঃকরণে পোষণ করতেন, কিন্তু সহিষ্ণু একটি দেশের কাঁধে ইংরেজি শাসনের যোয়াল চাপিয়ে রাখা ভাল কিংবা খারাপ,—এ সব বিষয়ে

তাঁর আবেগতপ্ত কোনো মন্তব্যই তিনি ছন্দে বেঁধে রাখেন নি।

তথাপি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ একটি অবশ্য স্মরণীয় বৎসর। মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' এবং রংগলালের রাজপুতকাহিনী 'পদ্মিনী উপাখ্যান'—দুটী রচনাই ছাপা হয় এই ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। যবন-বিদ্বেষ যে প্রাচীন মংগলকাব্যগুলিতে একেবারেই ছিল না, তা' নয়। কিন্তু স্বাধীনতা,—এই শব্দটিকে অবলম্বন করে পর-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এ রকম উত্তেজনা এর আগে আর কখনো উচ্চারিত হয়নি। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দেই বাংলায় প্রথম রাজনৈতিক স্বাধীনতাবোধের কবিতা লেখা হলো। তার অনেক পরে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে W. C Bonnerji-র সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার প্রথম অধিবেশন হয় এবং তারও প্রায় দশ বছর পরে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে দাদাভাই নারোজীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় মহাসভা প্রথম স্বরাজের দাবী উপস্থাপিত করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বংকিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলায় স্বাধীনতাবোধের কবিতা লেখবার জন্য যে 'idiom' জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল, কবি রংগলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তা' আপন করায়ত্ত করেছিলেন। তাই

বিংশ শতাব্দীর অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে আজ তাঁকে যতো ক্ষুদ্র এবং নগণ্যই মনে হোক্ না কেন, তাঁর সমসাময়িক লেখক ও পাঠককুলে এবং তাঁব পরবর্তী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তাঁর খ্যাতির পবিমাণ অথবা তাঁব রচনার মূল্য কোনটিই কম নয়।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

আধুনিক জ্যোতির্বেত্তার হিসাবে আমাদের এই পৃথিবীকে বলা হয়েছে, অসংখ্য গ্রহ-তারকাকীর্ণ বিপুল এক নক্ষত্র-নগরীর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। দিনের আলোয় জীবনের অনির্বাণ কোলাহল, রাতের অন্ধকারে জ্যোতিষ্কের আশ্চর্য দীপ্তি—এই হলো আমাদের বিশ্ব-জননীর রূপ। নীহারিকার চক্রপথ অতিক্রম করে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি এগিয়েছে আরো দূরে। ছায়াপথ পার হয়ে আবার কোটি যোজনের অন্ধকার, তারপর নতুন জগতের সীমারেখা, নতুন নগরীর দীপাবলী।

সাহিত্যের পথিমিতি-ও যেন এই হিসাবের অনুকূল। এই বিস্তীর্ণ সমুদ্রে শক্তিমান লেখকরা বিচ্ছিন্ন এক একটি মহাদেশের মতোই ভাসমান, তাঁদের মধ্যবর্তী ব্যবধানে স্বল্পক্ষম লেখকপুঞ্জের অবস্থান। বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় ভারতচন্দ্র থেকে মধুসূদন এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশের মতোই বিচ্ছিন্ন। কবিওয়ালার প্রতিনিধি ঈশ্বর গুপ্ত এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ এক যোজক।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তর্গত কার্য-কারণ-শৃংখলের অস্তিত্ব বিস্মৃত না হয়েও, প্রতিভাকে কিয়ৎপরিমাণে স্বয়ম্ভু বলা চলে। ভারতচন্দ্র মংগল-কাব্যের ধারা অনুসরণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু 'অন্নদামংগল কাব্য' উচ্চবংশের উত্তরপুরুষ মাত্র নয়—সৌন্দর্যে এবং ভাস্বরতায় অন্নদা-মংগল আকস্মিক। মধুসূদন দত্তের আবির্ভাবও এই অর্থে আকস্মিক, সুতরাং বিস্ময়কর।

ধর্মের প্রাধান্য-বিচারে বাংলাদেশ বাউল-বৈষ্ণবের দেশ। সাহিত্যের প্রবাহে এই ধর্মের রহস্যবোধ এবং আলুলায়িত, বিস্তারপ্রিয়, মন্থর প্রকাশ-রীতি উল্লেখযোগ্য দায়িত্বপালন করেছে। এ দেশের শাক্ত সাহিত্যও এই প্রভাব থেকে মুক্তি পায়নি। রামপ্রসাদের গান বৈষ্ণব পদাবলীর অতি নিকট-সম্পর্কিত। রামপ্রসাদ রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহের মধ্যস্থতায় মধুর রসাস্বাদনে ব্রতী ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁর বাৎসল্য-ভাবের ধর্মসংগীতগুলি বৈষ্ণব পদাবলীর তুলনায় কিছু কম আবেগ-ধর্মী অথবা অল্প আলুলায়িত নয়।

এই বাংলাদেশে একদা তন্ত্রের বিপুল আলোচনা হয়েছে ; নব্য ন্যায়ের জন্মভূমি হিসাবেও আমাদের দেশ স্মরণীয়। কিন্তু তন্ত্রের ধর্ম গণতান্ত্রিক নয় এবং ন্যায়শাস্ত্রও

জনসাধারণের মনোরঞ্জন করে না। সম্ভবতঃ এইসব কারণে আমাদের সাহিত্যের প্রকাশ-রীতিতে তন্ত্রের সংহতি অথবা ন্যায়ের যৌক্তিকতা এ দু'য়ের একটিও প্রভাব বিস্তার করেনি। পক্ষান্তরে, গণতান্ত্রিক বৈষ্ণব ধর্ম কখনো আলিংগন প্রদানে কার্পণ্য করেনি; বৈষ্ণব সাহিত্যও বাংলা এবং ব্রজবুলীর উদ্বাহ-বন্ধনে, শব্দের মাধুর্যে এবং ছন্দের ঐশ্বর্যে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত দেশের হৃদয় হরণ করেছিল। ভারতচন্দ্রের রচনায় সংহতি যে একেবারে ছিলনা, এমন নয়। এই সংহতির গুণেই ইংরেজি সাহিত্যে Bacon এর কোন কোন উক্তির মতো ভারতচন্দ্রের বহু পংক্তি প্রবচনের প্রচলন-বাহুল্য লাভ করেছে। এদেশের সাহিত্যের ভাবায় মধুসূদনই প্রথম আনলেন মন্ত্রের সংহতি। তথাপি মধুসূদনের অল্প কয়েকটি উক্তিও যে ভারতচন্দ্রের রচনার মতো জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত হতে পারেনি, তার কারণ, মধুসূদনের কবিতার ভাষা জনসাধারণের ভাষার ধার ঘেঁষেও চলে না। অবশ্য যে সময়ে তাঁর সাহিত্যিক সাধনার সূত্রপাত, সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকেই বাংলা গদ্যের ভাষা-প্রবাহে মোড় ফেরবার উপক্রম হয়েছে। রাধানাথ শিকদার এবং প্যারীচাঁদ মিত্র এই

নতুন ধারা প্রবর্তনের অগ্রণী। মধুসূদন তখন হিন্দু-কলেজের ভূতপূর্ব বিশিষ্ট ছাত্র, রাজনারায়ণ দত্তের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তির তিনি সন্তান, এবং তা' ছাড়া তিনি ছিলেন বিশিষ্ট দেশীয় খ্রীষ্টান। রাজভাষায় তাঁর অধিকারও বিদ্বজ্জনের বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছিল। এতোগুলি বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে মধুসূদন দত্ত খাঁটি বাঙালির সাধারণ, বিশেষত্বহীন লোকালয়ে অবতীর্ণ হতে সম্ভবতঃ কিছু কুণ্ঠিত ছিলেন। সে সময়ে কিশোরী-চাঁদ মিত্রের দমদম রোডের বাগানবাড়ীটি ছিল নব্যতন্ত্রের বংগীয় সাহিত্যিকদের 'মারমেড্ ট্যাভার্ণ'। একদিন এই বাড়ীতে এক বৈঠকে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ভাষার আলোচনা প্রসংগে বাংলার চলিত ভাষা সম্বন্ধে মাইকেল দত্ত বলেছিলেন, "It is the language of Fishermen, unless you import largely from Sanskrit." কেবলমাত্র তাঁর প্রহসন দুটি ছাড়া অন্যান্য সমস্ত রচনায় মাইকেলের ভাষা তাই গুরুগম্ভীর। তাঁর নাটকে অবশ্য ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল, কিন্তু সেও সংস্কৃতের অনুকরণে লেখা।

অলংকারবাদী বামন বলে গেছেন, "কাব্যং গ্রাহ্য-মলঙ্কারাৎ"। কিন্তু শুধু অলংকারের কল্যাণে রমণীমাত্রই

যেমন সুন্দরী হয় না, শুধু ভাষার নবত্বে রচনামাত্রই তেমনি নবীন হয় না। কাব্যশরীরের উৎকর্ষ সাধনের সংগে সংগে কাব্যের আত্মার বিকাশের দিকেও সমান দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। প্রকৃত মহৎ কাব্যে শব্দও প্রধান নয়, শব্দগত অর্থও প্রধান নয়,—প্রধান হচ্ছে এ দুয়ের ব্যঞ্জিত অর্থ। "স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ।"—পণ্ডিতেরা তাকেই বলেন 'ধ্বনি'।

বাংলা কাব্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব পদাবলী এবং লোক-সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য বিভাগে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব পর্যন্ত মোটামুটি বহিরংগ-সাধনার বাহুল্যই লক্ষিত হয়। এর ব্যতিক্রম দেখা যায় মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে। কিন্তু এই চতুর্দশপদী কবিতাগুলি ছাড়া তাঁর অন্যান্য কাব্যে 'ধ্বনি'-সৃষ্টির দিকে তিনি যথোচিত মনো-নিবেশ করেননি। 'মেঘনাদ-বধ-কাব্য' যুরোপীয় অর্থে Epic নয় এবং সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রোক্ত মহাকাব্যের লক্ষণবিশিষ্টও নয়। তথাপি 'মেঘনাদবধ' উৎকৃষ্ট কাব্য। কিন্তু এই গ্রন্থের চাকচিক্যময় শব্দাবলীর জ্যোতিঃ এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের তরংগাঘাত অতিক্রম করে,—কৃত্তিবাস, বাল্মীকি এবং মধুসূদনের রচিত কাহিনী-পরম্পরার প্রবাহ অনুসরণান্তে পাঠক যখন নবম সর্গের সীমান্তে উপনীত

হন, তখন কোন্ আশ্চর্য বাণী বা Message-ই বা তাঁর হৃদয়ায়ত্ব হয়? প্রকৃত মহাকাব্য বিশাল মহীরুহের মতোই ছায়া দেয়, আশ্রয় দেয়। মেঘনাদবধ কাব্যের আখ্যান এবং শৈলী লেখকের চাতুর্য ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক সন্দেহ নেই, কিন্তু চাতুর্য এবং পাণ্ডিত্য কাব্যের বহিরংগ সজ্জীকরণেই সমধিক পটু। তিলোত্তমা সম্ভব এবং বীরাংগনা কাব্যেও মধুসূদন ভাষা, ছন্দ এবং রীতির নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন। রোমক কবি Ovid-এর Heroic Epistles-এর আদর্শে ভারতীয় বীরাংগনাকুলের চিত্রাংকন কবির ব্যাপক দৃষ্টির পরিচয় বহন করে। আমাদের সাহিত্যের বহির্ভীরু প্রকৃতি পরিবর্তনে বংকিমচন্দ্র যেমন সহায়তা করেছেন গদ্যে, মধুসূদন তেমনি করেছেন কাব্যে। তথাপি "বীরাংগনা কাব্য" দেশের মাটিতে পদার্পণ করতে সংকুচিত। পৌরাণিক চরিত্রের স্বাভাবিক দূরত্বের দ্বারা এই সব বীরাংগনারা আমাদের পরিচিত পরিবেশের বহু দূরবর্তী, তদুপরি, আলোচ্য কবির কৃত্রিম প্রকাশভংগী বহুলাংশে এই দূরত্বের পরিমাণ বৃদ্ধির সহায়তা করে। এর ফলে, তারা, রুক্মিণী, কেকয়ী, সূর্পনখা প্রভৃতি একাদশ বীরাংগনা যাদুঘরের একাদশ মূর্তির মতো মৃতকল্প। (চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে কিন্তু মধুসূদন আপন

হৃদয়াভিমুখে দৃষ্টিপাত করেছেন। এর কারণ বোধ হয়, এই যে, মধুসূদন তখন তাঁর জীবনের 'শেষাংশে' পদার্পণ করেছিলেন ; নানা অভিজ্ঞতার তাড়নায় আন্দোলিত জীবনে যখন অপেক্ষাকৃত স্থির হবার দিন এলো,তখন তিনি নিজের হৃদয়ের গভীরতায় দৃষ্টিক্ষেপ করবার অবকাশ পেলেন। এদেশে অবস্থানকালেই যদিও তিনি প্রথম 'সনেট্' লিখতে আরম্ভ করেন, তবু চতুর্দশপদী কবিতাবলীর প্রায় সবগুলিই সুদূর বিদেশে ফ্রান্সে লেখা হয়। প্রবাসে স্বদেশের স্মৃতি স্বভাবতঃই মধুর এবং বিষাদকর। আর, সনেটের Form বা গঠনের প্রয়োজনেই তাঁকে অন্তর্মুখী হতে হয়েছে। সনেটের অষ্টক-ষড়কের বিভাগ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতোই হৃদয়জিজ্ঞাসু।

ভারতচন্দ্র এবং মধুসূদনের কাব্যের বৈষম্য শুধু যে উভয়ের বৈদগ্ধ্যাশ্রয়ী, তাই নয়। ভারতচন্দ্রের এবং অন্যান্য বাঙালি কবির তুলনায় মাইকেল অবশ্য অনেক বেশি পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু মাইকেলের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য তাঁর ব্যক্তিত্বে। ছন্দের উৎকর্ষ সাধনে এবং নতুন ছন্দ সৃষ্টির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ভারতচন্দ্র প্রভৃত সাহায্য করেছেন। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ-সৃষ্টি অথবা বাংলায় সনেটের প্রচলন এ হিসাবে কিয়দংশে বাংলা কাব্যের প্রাবন্ধ

প্রবাহাশ্রিত বলা চলে। Blank verse এবং Sonnet, এই দুই-ই তিনি বিদেশ থেকে আমদানি করেছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব তাঁর পূর্ববর্তী কোন বাঙালি কবিরই ছিল না। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর প্রথম জীবনে যে অবজ্ঞা ছিল, সে অবজ্ঞা কৃতবিদ্য, শক্তিমান, সাহিত্যরসিক, উন্নাসিক প্রতিভার অবজ্ঞা। তাঁর আত্মপ্রত্যয় এবং সাহস অবিস্মরণীয়। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবের জন্য তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাককে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হয়। Captive Lady, Rizia প্রভৃতি ইংরেজি কাব্যের লেখক, মাদ্রাজ-প্রবাসী মধুসূদনকে বাংলার সাহিত্য-জগতে লেখনী ধারণে প্রথম প্রণোদিত করেন তিনি-ই। তারপর তৎকালীন 'শিক্ষা সমাজের' সভাপতি বেথুন সাহেবও মধুসূদনের Captive Lady পড়ে তাঁকে বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করবার উপদেশ দিয়েছিলেন। এই মাদ্রাজ-প্রবাস কালেই তিনি বাংলা রামায়ণ এবং মহাভারত নতুন করে পড়তে আরম্ভ করেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের এক চিঠিতে বন্ধু গৌরদাসকে তিনি তাঁর তৎকালীন রোজ-নামচার পরিচয়ে, হিব্রু, গ্রীক্, তেলেগু, সংস্কৃত, ল্যাটিন এবং ইংরেজি পাঠে তাঁর অকল্পেয় অধ্যবসায়ের কথা লিখে

উপসংহারে প্রশ্ন করেছিলেন, "Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers ?" তাঁর এই অধ্যবসায়ও বাঙালি কবিদের সাধনার ইতিহাসে নতুন দেখা গেল। এই পরিশ্রমে তাঁর কোনদিন ক্লান্তি ছিলনা। এই অধ্যবসায়েব ফলে তিনি যে অসীম আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী হয়েছিলেন, তার নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁর প্রথম যুগের নাটক রচনাব ইতিহাসে।

বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ একটি স্মরণীয় বৎসর। এব পূর্বে কলকাতা সহবে স্বদেশী এবং বিদেশী চেষ্টায় এখানে-সেখানে অভিনয়েব ব্যবস্থা হয়েছিল বটে, কিন্তু, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুব এবং পাইক-পাড়ার রাজাদের আন্তরিক উদ্যোগে 'বেলগাছিয়া থিয়েটারের' যখন জন্ম হলো, তখন থেকেই অভিনয়েব প্রতি বংগীয় রসিকমণ্ডলীর আগ্রহ উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়। এখানে রামনারায়ণ তর্কবত্নের "রত্নাবলী" নামক নাটক-খানির অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। দর্শকদের মধ্যে বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ ইংরেজ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকও ছিলেন অনেক। সুতরাং ইংরেজি ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশ করা আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় পাইকপাড়ার

রাজাদের আমন্ত্রণে মধুসূদন দত্ত অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এইভাবে যখন তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো, তখন তিনি ঐ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দেই মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত শর্মিষ্ঠা-যযাতি-দেবযানীর কাহিনী অবলম্বন করে একখানি নাটক রচনা করলেন। পাইকপাড়ার সভাপণ্ডিত, খ্যাতনামা প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ এই শর্মিষ্ঠা নাটকে সংস্কৃত নাট্যসূত্রে বর্ণিত রীতির ব্যত্যয় লক্ষ্য করে যখন এই বইখানির নিন্দা করেন, তখন আত্মপ্রত্যয়শীল, মধুসূদন বললেন, "I shall either stand or fall by myself" এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সমন্বয়ে তাঁর দৃঢ় আস্থা ছিল। প্রেমচাঁদ মধুসূদনকে সংস্কৃত-রীতি অনুসরণ করে 'শর্মিষ্ঠা' রচনা করবার পরামর্শ দেন; পক্ষান্তরে, মাইকেল এই গ্রন্থের পাশ্চাত্য সৌরভে বিশেষ প্রসন্নতা লাভ করেছিলেন; কিন্তু আধুনিক পাঠকের চোখে শুধু "শর্মিষ্ঠা" কেন, "পদ্মাবতী" এবং বিয়োগান্ত ঐতিহাসিক নাটক "কৃষ্ণকুমারী"তেও সংস্কৃতের প্রভাব নগণ্য নয়। বিশেষ করে "শর্মিষ্ঠা" এবং "পদ্মাবতী"—এই দু'খানি নাটকে সংস্কৃতের প্রভাব অনপনিত। তৎসত্ত্বেও উপরিউক্ত তিনখানি গ্রন্থে তাঁর আত্মনির্ভরশীল, বিদগ্ধ, কবি-হৃদয়ের

ক্রমিক বিবর্তনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা'র মূল্য অসামান্য।

"চতুর্দশপদী কবিতাবলী" এবং "ব্রজাংগনা কাব্য" ছাড়া নাটক অথবা অন্যান্য কাব্য রচনায় মধুসূদন সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত দুই কাব্যে এবং তাঁর দুখানি প্রহসনে তিনি প্রধানতঃ বংগীয় কবিকুলের-ই উত্তরাধিকারী। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব রবীন্দ্রনাথেও স্পষ্ট এবং "ভানুসিংহের পদাবলী" "ব্রজাংগনা কাব্যেরই" পরবর্তী সার্থকতর সংস্করণ। বৈষ্ণব পদাবলীর গতানুগতিক ভাষা এবং রীতি অনুকরণ করলেও বৈষ্ণব কাব্যের আর্তি মধুসূদন উপলব্ধি করেননি, তথাপি কাব্যরূপবিশেষের পরীক্ষা হিসাবে "ব্রজাংগনা কাব্য" তাঁর সজীবতারই পরিচায়ক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮৫৬ থেকে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হয়েছে, শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাকে বলেছেন, মাহেন্দ্রক্ষণ। এই সময়ের মধ্যেই বিধবা-বিবাহ-আন্দোলন, সিপাহী-বিদ্রোহ, নীলকর ঘটিত সামাজিক চাঞ্চল্য, বিখ্যাত সাংবাদিক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশ পত্রের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা,

কেশব সেনের সহায়তায় ব্রাহ্মসমাজের শক্তিবৃদ্ধি, কবি ঈশ্বর গুপ্তের তিরোভাব এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভাব ঘটে। সামাজিক ইতিবৃত্তের এই পরিপ্রেক্ষিতে কবি মধুসূদন বর্তমান ছিলেন, একথা ইতিহাস-অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হ'তো, যদি-না তিনি ছুখানি প্রহসন লিখে যেতেন। মধুসূদন দত্ত এবং তাঁর উত্তব জীবনেব সমসাময়িক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,—এঁবা উভয়েই ছিলেন রোম্যান্সের ভক্ত। নব্যতন্ত্রেব বাংলা সাহিত্যেব সেই উন্মেষকাল অতীত বীবত্বেব এবং গতাসু সমাবোহেব স্মৃতিমুক্ত ছিলনা সত্য, কিন্তু এই সব পথিকৃৎ যুগপ্রবর্তক তাঁদের কোনো কোনো বচনায় সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থাব কিছু কিছু চিত্রাঙ্কনেও কার্পণ্য কবেন নি। "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে বোঁ" এবং "একেই কি বলে সভ্যতা," যে "মেঘনাদ-বধ কাব্যের" বচয়িতাব লেখা,—এ যেন এক প্রহেলিকা। এ ছু'খানি প্রহসনই তিনি বেলগেছিয়া থিয়েটাবের জন্য লিখেছিলেন। তখনও "পদ্মাবতী" রচিত হয়নি। কবি-জীবনের সেই প্রথমাংশেই আত্মবৈশিষ্ট্যসচেতন মধুসূদন তাঁব আভিজাত্য-বোধের গণ্ডী অতিক্রম কবে হানিফ-ফাতেমা-পুঁটি-বাচস্পতি-নিতম্বিনী-পয়োধবীর ক্লেদপিচ্ছিল

কুটীরাঙ্গণের পরিচয় সংগ্রহ করেছিলেন, এবং এই সব মূঢ়-ম্লান-মূক মুখে ভাষা দেবার চেষ্টাও তিনি করে গেছেন। বাংলা দেশের দরিদ্র কৃষকের দুঃখে সহানুভূতি পোষণ করা এখনকার মতো তৎকালীন সমাজের 'ফ্যাশান' ছিলনা। তবু মধুসূদন লিখেছিলেন "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ," বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন "সাম্য," দীনবন্ধু লিখেছিলেন "নীলদর্পণ"। "একেই কি বলে সভ্যতা"-য় মধুসূদন মদ্যপানের অপকারিতা সম্বন্ধে সমসাময়িক সমাজকে অবহিত হবার পরামর্শ দিয়েছেন। পরবর্তীকালে দীনবন্ধু মিত্র এই বইখানির ছায়াবলম্বনেই তাঁর "সধবার একাদশী" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তা'ছাড়া এর অন্তর্গত রীতির প্রভাবও পরবর্তী সাহিত্য-ধারায় বর্তমান। বাঙালি প্রহসন লেখক, অমৃতলাল বসুর একটি উক্তি এর প্রমাণস্থল:—"একেই কি বলে সভ্যতা"র অনুকরণে আমি একখানা Farce রচনা করিলাম—"একেই কি বলে তোদের বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির ধারা?" বলা বাহুল্য. অমৃতলালের এই বইখানি অধুনা লুপ্ত।

মধুসূদন দত্তের এই প্রহসন দুখানির বিশেষত্ব অন্য কারণেও স্বীকার্য। তিনি প্রধানতঃ কবিতার গঠন এবং ছন্দের রূপ অবলম্বন করে নানা পরীক্ষা করে গেছেন।

কিন্তু গদ্যের গঠন সম্বন্ধেও তিনি চিন্তা করেছেন এবং পরীক্ষাও করেছেন,—তার প্রমাণ তাঁর প্রথম জীবনের প্রহসন, তাঁর নাটকের গদ্য এবং তাঁর শেষ জীবনের "হেক্টর বধের" ভাষা।

মধুসূদনের সমসাময়িক ছিলেন বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র। এই তিন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের চারিদিকে সে সময়ে অন্যান্য বহু শক্তিমান লেখকের আবির্ভাব ঘটেছিল। এঁদের প্রতিভার জ্যোতিঃপাতে বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর এবং জন্মান্তর লাভ হয়েছে। তারপর, কিছুকাল অতিবাহিত হবার পূর্বেই আবার এক নতুন নক্ষত্র-নগরীর দীপ্তি উদ্ভাসিত হলো। সেই তারকালোকের এবং সমগ্র বাংলা-সাহিত্যের অকলনেয় বৃহস্পতি, রবীন্দ্রনাথ।

চতুর্দশপদীর পদসঞ্চার..

একজন বিদেশী সমালোচক 'চতুর্দশপদী' কবিতার উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসে লিখেছেন, সবেগ সঞ্চরণ ও ঘূর্ণনের জন্য চাতক পাখীর ডানায় প্রকৃতির যে কারুকার্য দেখা যায়, চিলের বা য়্যাল্‌বাট্রসের পাখায় ঠিক তেমনটি নেই। এই শেষোক্ত পাখীদের জীবনযাত্রায় একটানা অনেকক্ষণের জন্য আকাশে ভেসে থাকবার প্রয়োজন হয়; তাই তাদের ডানায় প্রকৃতি আর এক রকম শক্তি দিয়েছেন।

সব পাখীর ডানা এক রকম নয়, কারণ, সব পাখীর প্রয়োজন এক জাতের নয়। মানুষের দিগন্তবিহীন মনের আকাশ এতো বিস্তৃত,—এতো দুরতিক্রম্য তার ব্যাপ্তি, যে এক জোড়া ডানায় ভর করে থাকলে তার চলে না। মানুষের শিল্প-সাধনার ইতিহাস হলো এই ডানা-বদলের ইতিহাস। একই যুগে একজন কবির রচনায় বিভিন্ন প্রকৃতির কাব্যরূপের প্রকাশ দেখলে তাই বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই। যিনি গল্প লিখে নাম করেছেন, তিনি

কবিতা লিখেও খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, এমন দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তেও বিরল নয়।

সাহিত্যের যে কোনো রূপ নিয়েই আলোচনা করা যাক্ না কেন,—কাব্যরূপমাত্রেই কোনো না কোনো প্রকার সংযমবিধি। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ একটি কাব্যরূপ যতো মুক্তির প্রতিশ্রুতিই বহন করুক্ না কেন, নতুনতর সংযমের স্বীকৃতিতেই তার প্রতিষ্ঠা। একই মানুষের একাধিক সত্বাবোধ আধুনিক মনোবিজ্ঞানেও স্বীকৃত হয়েছে। 'জেকিল ও হাইড্'-এর কাহিনী সত্যনিরপেক্ষ রূপকথা নয়। ওর মধ্যে সব না হোক্, অন্তত, কিছু সত্য আছে। গণিতের অধ্যাপক, ভারিক্কি চালের লোক লিয়ুইস্ ক্যারল্ সাহেব-ই শিশুমনোহারী "Alice in Wonderland"-এর লেখক ছিলেন। মানুষ হিসেবে মধুসূদন দত্ত কতোগুলি বিভিন্ন সত্বার সমাহারের ফল, সে সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। তবে, সাহিত্য যে-হেতু চিত্তবিশেষের পরিচয় বহন করে এবং চিত্তবিশেষ যে-হেতু সমাজের অন্তর্গত ভাব-প্রবাহের উচ্ছ্রিত ফেনপুঞ্জের সঙ্গে কিয়দংশে তুলনীয়, সেজন্য 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর, আলোচনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নের বাংলা দেশের এবং বাঙালি সমাজের

অবস্থাও বিচার্য। প্রমথ বিশী ভালোই বলেছেন, "রাম-মোহন নূতন বাংলাব প্রথম মানুষ আর মধুসূদন নূতন বাংলার প্রথম কবি।" কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় রাজসরকারের দপ্তর-বদলিতেই এদেশে মোগলের তিবোভাব এবং ইংরেজের আবির্ভাব রূপায়িত হয় নি। ভাবান্তবেই যুগান্তব। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের ভাবাবর্তে যে চাঞ্চল্য ও অসন্তোষেব সূত্রপাত, যে বিরক্তি ও আকাঙ্ক্ষার গুঞ্জন,— সই ঐতিহ্যের সাক্ষাৎ উত্তবাধিকারী রূপে মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরিচয়। অমিত্রাক্ষরেব মুক্তি এবং 'সনেট্'এর বন্ধন একই লেখকের হাত দিয়ে আমাদের সাহিত্যে বোধ হয় এই কাবণেই পরিবেশিত হতে পেবেছিলো। মধুসূদন-ই আমাদেব সাহিত্যিকদেব মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ সাহিত্যে প্রথম বিদগ্ধ বসিক। তবু যথোচিত সতর্ক হবার তাগিদ তাঁব ছিল না। কথাটা বাড়াবাড়ি শোনালেও, বলা যায় যে, তিনি যেন রাজনৈতিক ইতিহাসেব সেই সব নিষ্ক্রিয় নায়কের-ই কতকটা স্বগোত্র, যাদের অবলম্বন কবে বৃহৎ মানব-সভ্যতা নতুন পথ খুঁজে নেয়। নানা অবস্থার সমাবেশে-ই নতুন আদর্শেব জন্ম হয়। আদর্শ সকল ক্ষেত্রেই সামাজিক অবস্থানির্ভরশীল। ভৌগোলিক চৌহদ্দি মেনে চলবাব দায় তা'র নেই।

জার্মাণীর মার্কস্‌বাদ এই কারণেই রাশ্যায় আত্মবিকাশের অবকাশ পেয়েছিল। ইতিহাসের গতি আপাতদৃষ্টিতে স্ত্রী-চরিত্রের মতোই দুর্জ্ঞেয়। তবে, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের কল্যাণে স্ত্রী-চরিত্র যেমন বহুকাল-প্রতিহত পুরুষের অনু-সন্ধিৎসায় উদ্ঘাটিত হচ্ছে, সমাজতাত্ত্বিক দার্শনিকদের প্রসাদে ইতিহাসের গতিপথের একটা ঝাপসা ধারণাও আজকাল তেমনি আমাদের জ্ঞানগম্য হয়েছে। মানুষের শিক্ষাসভ্যতা-সংস্কৃতি, যুদ্ধ-মিলন-শান্তি—এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি অত্যন্ত ধীর নৈপুণ্যে মানব-জাতিকে এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে পার করছেন। প্রকৃতির ব্যবস্থায় আকস্মিকতা নেই,—আছে মন্থর অতিক্রান্তি। ফরাসী-বিদ্রোহের অনেক আগে থেকেই ফরাসী-বিপ্লবের কারণগুলো জমা হচ্ছিল। রাম না হতেই রামায়ণ লেখার সম্ভাবনা অলৌকিক মনে করবার সত্যই কি কোনো হেতু আছে?

মধুসূদন দত্তের সম্বন্ধে 'নিষ্ক্রিয়'-শব্দ ব্যবহার হঠাৎ দেখলে আপত্তিকর মনে হওয়া স্বাভাবিক। ছাত্রের মতো সারা জীবন যিনি লেখাপড়া করে গেছেন,—বন্ধু-বান্ধবের কাছে লেখা চিঠিগুলিতে যাঁর অক্লান্ত সাহিত্যাভি-নিবেশের খবর পাওয়া যাচ্ছে, সেই বহুভাষাবিদ্, বহু

সাহিত্যাভিজ্ঞ মাইকেল মধুসূদন দত্ত-কে নিষ্ক্রিয় মনে করবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু নিষ্ক্রিয়ের উল্টো শব্দটা যদি কোনো কবির প্রসঙ্গে ব্যবহার করতে হয়, তা'হলে একমাত্র সেই কবির সম্বন্ধেই তা' প্রযোজ্য, যিনি শুধু জ্ঞান অর্জনের দ্বারা এক দেশের রীতিকে অন্য দেশে চালান করেন না, অস্পষ্ট অসন্তোষের ফলে অমার্জিত হীরক লাভ করে খুশি থাকবার প্রবৃত্তিও যাঁর নেই,— যিনি নবলব্ধ ঐশ্বর্যের উৎকর্ষসাধনে বিমুখ হতে পারেন না, যিনি হীরকের মূল্য বিচারেও সমান পটু। (ব্রেজিলের মাটিতে হাঁটতে-হাঁটতে মধুসূদন হঠাৎ যেন বৃহৎ এক হীরকখণ্ডে হোঁচট খেয়েছিলেন। কিন্তু মণিকারের বৃত্তি তাঁর অভ্যাসবিরুদ্ধ। তাই মাটি এবং পাথরের পিণ্ড থেকে সেই অমূল্য রত্ন উদ্ধার করে, ঘসে মেজে বীণাপাণির আভরণ সৃষ্টি করবার অসীম ধৈর্যের পরিচয় "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"তে নেই।) অমিত্রাক্ষর ছন্দসৃষ্টি সম্বন্ধেও এই মন্তব্যটি খাটে। অমিত্রাক্ষরের আসল জোর যে তার যতি ও ছেদের বৈষম্যে, —অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় যেমন বলেছেন, অমিত্রাক্ষর যে অমিতাক্ষর এ-কথাটা বেশ স্পষ্ট করে মধুসূদন তাঁর কোনো বন্ধুকে লেখা কোনো চিঠিতেও লেখেননি। "মিত্রাক্ষর" নামের একটি চতুর্দশপদীতে তিনি বাংলা

কাব্যে মিত্রাক্ষর প্রয়োগরীতি দেখে দুঃখ করেছেন, "চীন-নারীসম পদ কেন লৌহ ফাঁসে?" Blank verse-এর অনুকরণে সৃষ্ট নতুন ছন্দ বাংলা কাব্যকে লৌহ-ফাঁস থেকে যে মুক্তি দিল, সে মুক্তি যে কতো বড় মুক্তি, তা'র কিছু ধারণা তাঁর অবশ্য ছিল, কিন্তু লৌহ-ফাঁস যে যতি ও ছেদের একত্রোপস্থিতির অনিবার্যতা—একথাটা আরও স্পষ্ট ভাবে বলে যাওয়া তাঁর মতো বুদ্ধিমান, বিদগ্ধ লেখকের কর্তব্য ছিল।

"চতুর্দশপদী কবিতাবলী" প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৬৫-১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রবাস-যাপনেব সময়ে একশোটি 'সনেট' লেখা হয়। মেঘনাদবধ কাব্য বচনার সময় একদিন সকালে মধুসূদন একটি কবিতা লেখেন, তার নাম 'কবি মাতৃভাষা'। আট-ছ'য়ের যোগে চোদ্দ মাত্রা এবং চোদ্দ চরণের এই কবিতাটি অন্ত্যানুপ্রাসের পদ্ধতি সূত্রাকারে প্রকাশ করা যায় এই ভাবে:— "কখকখ কখকখ গঘঘ গঘগ"। স্পষ্টই দেখা যায়, খাঁটি ইটালিয়ান সনেটের ঢঙে এই কবিতাটি লেখা হয়নি। রাজনারায়ণ বসুর কাছে একটি চিঠিতে এই কবিতাটি পাঠিয়ে তিনি লিখেছিলেন, "I want to introduce the sonnet into our language."। পরবর্তীকালে

'বঙ্গভাষা, শিরোনামায় পরিবর্তিত আকারে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। (Surrey) স্যরে-প্রবর্তিত সনেটের অষ্টকের অন্ত্যানুপ্রাসরীতির সঙ্গেও আলোচ্য রীতির মিল নেই।

এর পরে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশ থেকে বন্ধু গৌরদাস বসাকের কাছে লেখা তাঁর আর একখানি চিঠি থেকে জানা যায় যে, পেত্রার্কার সনেট্ পড়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন এবং শুধু তাই নয়,—"I have been lately reading Petrarch—the Italian Poet, and scribbling some "sonnets" after his manner."। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর' অন্তর্গত 'উপক্রমে' অংশে মধুসূদন ফ্রাঞ্চিস্কো পেত্রার্কা কবিকে স্মরণ করেছেন। তাসো এবং পেত্রার্কার কাব্য মূল ভাষায় তাঁর পড়া ছিল। 'কবিগুরু দান্তে'—এই শিরোনামায় তিনি আর একটি 'সনেট্' লিখে গেছেন। তা'তে 'Inferno'-র কবির উদ্দেশে যদিও প্রণাম সঞ্চিত আছে, বিয়াত্রিচের উপাসকের কোনো উল্লেখই নেই।

ইটালিয়ন সনেট্-এর জন্মদাতা ছিলেন পেত্রার্কা,—এই ভ্রান্ত মত আজকাল অনেকে পোষণ করেন, দেখা গেছে। পেত্রার্কা ছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীর লোক, তাঁর আয়ুষ্কাল ১৩০৪ থেকে ১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দ অবধি। দান্তে তাঁর পূর্বগামী। ১২৬৫ থেকে ১৩২১ খ্রীষ্টাব্দ

পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। বিয়াত্রিচের উদ্দেশে দান্তে এবং লরা-র উদ্দেশে পেত্রার্কা প্রেম ও সৌন্দর্যোপাসনার যে চতুর্দশপদীগুলি লিখে গেছেন, সেইগুলিই ইটালিয়ন সনেটের গৌরবময় আদি স্তর গড়ে তুলেছে। তাঁদের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন মিকায়েলেঞ্জেলো এবং ভিটোরিয়া কলোনা। তাঁরাও ইটালীর অধিবাসী এবং তাঁরাও সনেট্ লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সনেট্ এর গঠন-নির্দেশ দান্তের দ্বারাই স্পষ্ট ও সার্থকভাবে সম্ভব হয়। পরবর্তী কবিরা দান্তের আদর্শ অনুসরণ করেই এগিয়েছেন,—একথা বিশেষ ভুল নয়। কিন্তু দান্তের আগেও সনেটের একটা ইতিহাস খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য নয়। তবে সে অঞ্চলে নানা মুনির নানা মত পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা-পরায়ণ। অধুনালুপ্ত 'কল্লোলে' প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর লেখা একটি সুখপাঠ্য, তথ্যবহুল প্রবন্ধ থেকে চতুর্দশপদী কবিতার আদি যুগের এই ইতিবৃত্ত এখানে তুলে দেওয়া যেতে পারে :—

'অনেকে গ্রীক কবিতার Epigramএর সঙ্গে ইতালীয় সনেটের বিলক্ষণ মিল দেখ্‌তে পান ; এবং কোনো কোনো প্রাচীন কবি নাকি সনেট্ লিখে এপিগ্রাম নামে চালিয়েছেন। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্বে

গ্রীক্ কাল্চার ইতালিতে অজ্ঞাত ছিলো ; কাজেই দান্তের পূর্বপুরুষগণ নিশ্চয়ই গ্রীক্ নন্। কেউ কেউ বলে থাকেন যে প্রভঁস-প্রদেশের ত্রুবাদূর্ (troubadour)গণ তাদের মাতৃভাষায় যে-সব গান ও ছড়া বেধে মুখে মুখে ছড়িয়ে বেড়াতো, তারি প্রভাবে ইতালীয় সনেট্ এর আবির্ভাব। অন্য দলের মতে (দান্তে ও পেত্রার্কা দু'জনেই নাকি এ-মতের পরিপোষক ছিলেন) সিসিলিতে আবরদের সংস্পর্শে এসেই ইতালিয়নরা সনেট্ লিখতে শেখে। প্রাচীনতম ইতালিয়ন্ কবিতায় আব্বিয়ানা খুব বেশি বলে আজকাল এ মতই অভ্রান্ত ব'লে দাঁড়িয়ে গেছে।”

মধুসূদন পেত্রার্কার কাছেই তাঁর পাঠ নিয়েছিলেন, তবু চতুর্দশপদীর আত্মা তাঁর চোখে পড়ে নি। এই মন্তব্যটি অপ্রিয় বটে, কিন্তু সত্য প্রকাশের জন্য একথা বলতেই হয়। Theodore Watts Dunton, একটি সনেট্ লিখেছেন—সনেটের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করাই তার লক্ষ্য। সেই পদের 'ধড়ক'টি এমনি—

A sonnet is a wave of melody
From heaving waters of the
impassioned soul
A billow of tidal music one and whole
Flows in the "Octave"; then returning free;

Its ebbing surges in the "Sestet" roll
Back to the deeps of Life's tumultuous sea.

অষ্টকের উচ্ছ্বাস ষড়কের অবরোহণে সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু এই দুই অংশের অন্তর্নিহিত ঐক্য সত্ত্বেও এরা যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন—এই তত্ত্বটি মধুসূদন সম্যক্ উপলব্ধি করেননি। নিরপেক্ষ অথচ সহানুভূতিশীল পাঠকের চোখে এ-কথা সহজেই ধরা পড়ে, যে, এই কবির মনে দু' একটি স্থলে ছাড়া অন্য কোথাও সনেট্ লেখবার প্রকৃত তাগিদ ছিলনা।

আত্মকেন্দ্রিকতা গীতিকাব্যের সহজ ধর্ম। সনেট্ মানেই আত্মকেন্দ্রিক কবিতা কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক কবিতা মানেই সনেট্ নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শক্তিমান ইংরেজ কবিদের মধ্যেও অনেকে সার্থক সনেট্ লিখতে পারেননি, অথচ সুন্দর কবিতার রচয়িতা হিসেবে তাঁদের খ্যাতি বিদ্বজ্জনস্বীকৃত। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কোল্‌রিজের' নাম করা যায়। বহিরাবয়বটি নিখুঁত হবে, অন্তরটি খাঁটি হবে—এই দু'য়ে মিলিয়ে চতুর্দশপদীর সার্থকতা। শেলীর কবিতা, "Ozymandias"এর ধর্ম সনেটের, কিন্তু ওর পরিচ্ছদে ত্রুটি আছে। তাই 'সনেট্' ওকে বলে না। উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে প্রশান্ত সংযমের উদ্বাহ-বন্ধনেই সনেটের সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্যসৃষ্টির কৌশল আয়ত্ত

করবার ধৈর্য অসংযত প্রতিভার পক্ষে অসম্ভব। রসিক মধুসূদন বিদেশী ভাষায় লেখা চতুর্দশপদী কবিতার মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন, দেশপ্রেমিক মধুসূদন মাতৃভাষার উৎকর্ষ সাধনের তাগিদে য়ুরোপের কাব্যকানন থেকে সনেট্ আহরণ করেছিলেন, কবিত্বশক্তি-গর্বিত মধুসূদন সনেটের ছাঁচে ঢেলে কিছু কবিতাও লিখে ফেলেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি কবিতার জন্মলগ্নে আবেগ-স্পন্দিত, সংযম-শাসিত কবিচিত্তের হিমাংশুকিরণপাত সম্ভব হয়েছে। 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' অথবা 'বসন্তে একটি পাখীর প্রতি' এই ধরণের সার্থক চতুর্দশপদী কবিতা। "শ্রীমন্তের টোপর" শিরোনামায় তিনি যে কবিতাটি লিখেছেন, বিষয়-বস্তুর প্রকৃতির জন্য মধুসূদন দত্তের কাব্যালোচনায় তা' আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু রসিক এবং বিদগ্ধ হলেও অসতর্কতার অভিযোগে তিনি যে সত্যই অভিযুক্ত হতে পরেন, তার নজির এই কবিতাটির সর্বাঙ্গে লিপ্ত। এর 'অষ্টকে' প্রথম 'চৌপদ'এর (quartrain) সঙ্গে দ্বিতীয় চৌপদের অতিরিক্ত গা-ঘেঁষাঘেঁষিই যে শুধু পীড়াকর, তাই নয়, এই কবিতায় অষ্টম পঙ্‌ক্তি নবম পঙ্‌ক্তির মধ্যে ভিড়ে গেছে। Theodore Watts Dunton —লিখিত পূর্বোদ্ধৃত কবিতায় সনেটের প্রথম আট

পঙ্‌ক্তিতে ভাবের যে পরিপূর্ণ সুসংহতির কথা বলা হয়েছে, সেই খাঁটি আদর্শের দিকে দৃষ্টি রেখে মধুসূদন দত্তের চতুর্দশপদী কবিতাগুলির বিচার করতে বসলে বিশেষ সাধুবাদ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কেবল বাক্যগত অর্থ সম্বন্ধেই এই কথা। ✓কিন্তু কবিতা তখনই মহৎ হয় যখন বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে আরো এক অন্যতর ধ্বনির আভাষ মেলে। নিরলঙ্কৃত বাক্যও কাব্য হতে পারে, কিন্তু বাচ্যার্থের অতিক্রান্তি যেখানে নেই কাব্যের রসোত্তীর্ণ সার্থকতাও সেখানে নেই।✓ আলোচ্য 'সনেট্'-টি একবার স্মরণ করা যাক :—

শ্রীমন্তের টোপর

হেরি যথা সফরীরে স্বচ্ছ সরোবরে,
পড়ে মৎস্যরঙ্ক, ভেদি সুনীল গগনে,
(ইন্দ্র-ধনুঃ-সম দীপ্ত বিবিধ বরণে)
পড়িল মুকুট, উঠি, অকূল সাগরে,
উজলি চৌদিক শত রতনের করে,
দ্রুতগতি ! মৃদু হাসি হেম ঘনাসনে
আকাশে, সম্ভাষি দেবী, সুমধুর স্বরে,
পদ্মারে, কহিলা—"দেখ, দেখ, লো, নয়নে,

অবোধ শ্রীমন্ত ফেলে সাগরের জলে
লক্ষের টোপর সখি ! রক্ষিব, স্বজনি,
খুল্লনার ধন আমি।”—আশু মায়াবলে
স্বর্ণ-ক্ষেমঙ্করী রূপ লইলা জননী।
বজ্র-নখে মৎস্যরঙ্কে যথা নভস্তলে
বিঁধে বাজ, টোপর, মা ধরিলা তেমনি।

বলা বাহুল্য সনেটের আঙ্গিকে এই গুরুতর ত্রুটি দুঃসহ। ‘অষ্টকে’ অর্থের প্রাথমিক সমাপ্তি যদি না ঘটে, তা’হলে অষ্টকের ভাগটাই যে অলীক প্রতিপন্ন হয়। “সমাপ্তে” নামক কবিতাটিতেও এই জাতের বিচ্যুতি ঘটেছে। এ-ক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণ করা অযৌক্তিক নয়, যে, মধুসূদন বোধ হয় সনেটের আঙ্গিকের সূক্ষ্ম আইন-কানুনের দিকে দৃষ্টিপাত করবার অবকাশ পেয়ে ওঠেননি।

বাংলা ভাষায় ঢিলেমি এবং কোমলতার আতিশয্য নিবারণের জন্য যিনি গুরু আয়তনের তৎসম শব্দ ব্যবহারে কার্পণ্য করেননি, সনেটের আইন জেনে শুনেও চতুর্দশপদী কবিতা রচনায় আঙ্গিকের ব্যাপারে এমন ঢিলেমির প্রশ্রয় তিনি কেনই বা দিলেন ? চোদ্দ চরণে সম্পূর্ণ কবিতাই যে চতুর্দশপদী সনেট্ নয়, এ কথা তিনি কি জানতেন না ?

চতুর্দশপদীর পদসঞ্চার

'অষ্টক-'ষড়কের' ভাগ যে "চতুর্দশপদী" কবিতার একটি অবশ্যপালনীয় বৈশিষ্ট্য,—এ কথা বাংলা-সাহিত্যে সনেট্-আবিষ্কারকের অবিদিত ছিল, এমন ধারণা পোষণ করাও অসংগত মনে হবে। বরং এই বিশ্বাসের দিকেই পাঠকের অভিরুচি সহজ হয়, যে বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দস্রষ্টা এবং প্রথম চতুর্দশপদী কবিতা রচয়িতা, মধুসূদন দত্ত, উনবিংশ শতাব্দীর 'মহাভারত' রচয়িতা নবীন সেনের মতোই অসতর্ক। 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' পত্রে একদা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মধুসূদনের সনেট্ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তাতে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাদে নিরস্ত ছিলেন। তার কারণ বোধ হয়, মধুসূদন-রচিত এই কবিতাগুলির অন্তর্লীন ত্রুটি সম্বন্ধে বঙ্কিম অবহিত ছিলেন।[৮] আঙ্গিকের দোষ ছাড়া আর এক রকম দোষ এই চতুর্দশপদী কবিতাবলীর বৈশিষ্ট্য। মধুসূদনের একটি মুদ্রাদোষ 'সু' শব্দের বহুল ব্যবহার। পরবর্তী চতুর্দশপদী-রচয়িতা দেবেন্দ্রনাথ সেনেরও এই দোষ ছিল। বুদ্ধদেব বসু তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সু-রাজ্য, সু-হাসিনী, সু-বদনা, সু-প্রবাহ প্রভৃতি শব্দে এই সব কবিতা কণ্টকিত। বুদ্ধদেব বাবু 'সু-সুন্দরী'

শব্দটিও উল্লেখ করেছেন। 'বটবৃক্ষের' দুহিতা হচ্ছে তার ছায়া। এই কবি-কল্পনা সত্যই আনন্দদায়ক। কিন্তু একটি শব্দের দোষে একটি চমৎকার উপমাও যে কি ভাবে হাস্যোদ্দীপক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তার দৃষ্টান্ত আছে 'বটবৃক্ষ' নামের চতুর্দশপদী কবিতাটিতে। আস্তো ছবিটিই তুলে দেখা যাক :—

"প্রত্যক্ষতঃ ভারত সংসারে
বিধিব করুণা তুমি তরুরূপ ধরি!
জীবকুল হিতৈষিনী, ছায়া সু-সুন্দবী,
তোমার দুহিতা, সাধু!"

'আশ্বিন মাস' সম্বন্ধে কবিতাটির প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই দেখা যায়: "সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।" আশ্বিন মাস শুনলেই তো আমাদেব চোখেব সামনে শ্যামের গায়ে শুভ্র কাশ ফুলের শুচিতা ভেসে ওঠে, কিংবা শুনতে পাই শানাই-এর আলাপ। আব মধুসূদনেব কবিতায় বানেশ্বরী, মহিষ-মর্দিনী, শিখিধ্বজ, গণদেব—সকলের কথাই আছে; শুধু কাশফুল সেখান থেকে নির্বাসিত এবং সূর্যকিরণ সেখানে অনিমন্ত্রিত। রসেটি লিখেছিলেন 'A sonnet is a moment's monument."। 'সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ' চতুর্দশপদী-র একটি চরণে সংকীর্ণ একটু

জায়গা পেয়েই ধন্য হয়েছে,—মুহূর্তের বিস্ময়ের স্মৃতিস্তম্ভ রচনার মালমশলা মধুসূদন সেখানে খুঁজে পান নি। এ-ছাড়া আর একটি দোষ, 'স্বরভক্তি'র দ্বারা হাস্যোদ্দীপক ভাবে শব্দভঙ্গ ঘটানো। 'বরিষায়' (বর্ষায়), 'গরজিলা' (গর্জিল), প্রভৃতি রূপান্তর আমাদেব সয়ে গেছে, কিন্তু "দগধে আগ্নেয় তাপে" অথবা "শবদে-শবদে বিয়া" নিঃসন্দেহে শ্রুতিনিপীড়ক।

এই আলোচনায় ধবা পড়ে যে, কাব্যরূপের বহিবাবয়ব সম্বন্ধে অতি মনোযোগের ঝোঁক ভারতচন্দ্রেব কাল থেকে আবম্ভ কবে কবিওয়ালার রচনায় এবং তদীয় উত্তরাধিকারী ঈশ্বব গুপ্তের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে মধুসূদনেব প্রতিভাকেও সংক্রামিত করেছে। "কলকোকিল অলিকুল বকুল ফুলে"—এই বকম অনুপ্রাস ব্যবহাবেব দ্বারা প্রথমোক্ত কবি কাব্য-শবীবে সৌন্দর্য উৎপাদনেব প্রয়াস করেছেন। কবিওয়ালাবা প্রায় সকলেই অনুপ্রাসসিদ্ধ ; ঈশ্বব গুপ্তেব আধ্যাত্মিক কবিতা অনুপ্রাস-বাহুল্যেই কলুষিত ! এই সব কবিবা নতুন পথ খুঁজেছেন কিন্তু বাংলা এবং সংস্কৃতেব প্রাচীবে ঘেবা ছোট ক্ষেত্রটিতে বারে বারে যে বসন্তেব পদচিহ্ন পড়েছে, সে বসন্ত দীর্ঘ অভ্যাসের দ্বারা জীর্ণ। তার সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগ ছিন্ন, অন্তর্লোকের

যৌবন তখন সামাজিক এবং রাজনৈতিক জড়তায় শ্রান্ত। উনবিংশ শতাব্দীর সুরু থেকেই রাজনৈতিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হতে আরম্ভ করেছে। পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্ত্তী আড়াল হয়েছে অপসারিত। বন্যাব প্রথম ঝোঁকে মিল, স্পেন্সর, বেন্থাম যেমন অনিবার্য ভাবে এদেশের চতুঃ-সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়েছেন, তেমনি বিদেশের সাহিত্যও এসেছে এবং তার সঙ্গে এসেছে সাহিত্যেব বিভিন্ন অবয়ব, বিভিন্ন রূপ,—যেমন Blank verse, sonnet, উপন্যাস, নাটক। কৈশোরে এবং প্রথম যৌবনে বাংলা ভাষার প্রতি মধুসূদনের যে তীব্র বিরাগ দেখা যায়, সে বিরাগের জন্ম বাধাপ্রাপ্ত যৌবনের বৈফল্য-বোধে। তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে—অর্থাৎ মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী বাংলা সাহিত্যে কোথায় সেই উন্মথিত যৌবন, যা' সত্যিকাব একটি যুবকের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারে? হিন্দু কলেজের ছাত্র মধুসূদন Richardson-এর হাতের লেখা পর্যন্ত নকল কবতে চাইতেন। তারপর সুবিস্তীর্ণ পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমুদ্রে যখন তিনি পাড়ি দিলেন তখন,—তখন আর সেই "যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে"? সেই ব্যাকুলতার দিনে সতর্কতার শাসন ছিল না। হৃদয় তখন উদ্দাম, বুদ্ধি তখন অস্থির। পশ্চিমের সাহিত্যে যা' কিছু তাঁর ভালো লেগেছে, বাংলা

সাহিত্যে তাড়াতাড়ি তাই নিয়ে এসেছেন। সেই সঙ্গে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সম্পদের দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত করবার শিক্ষাও তিনি পেয়েছেন। রামায়ণ, মহাভারত অবশ্য বাল্যকালেই তাঁর প্রিয় ছিল। ব্রজাঙ্গনা কাব্য প্রাচীন বৈষ্ণব কাব্যের অসার্থক অনুকরণ। রবীন্দ্রনাথও বৈষ্ণব কাব্যের অনুকরণ করেছেন। কিন্তু 'ভানুসিংহের পদাবলী' ছাড়িয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত কোন্ অলক্ষ্য গিরি-শৃঙ্গেই না উপস্থিত হলেন! পক্ষান্তরে, মধুসূদনের ব্যাপক প্রয়াস কোনোদিনই গভীর ধ্যানের পথ খুঁজে পায় নি। 'অমিত্রাক্ষরে' তিনি ছন্দের মুক্তি দিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেমন দিয়েছেন, তেমন কোনো বৃহৎ জীবনবেদ তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি; ব্রজাঙ্গনা-বীরাঙ্গনা-তেও বহিরাবয়ব নির্মাণের সিদ্ধি। নির্মিতি বা craft তাঁর হাতে পূর্ণাঙ্গ কলা বা art হয়ে উঠেছে অল্প কয়েকটি স্থলে। এই একই মানুষ মধুসূদন আজ থেকে প্রায় আশি বছর আগে ফ্রান্সের ভার্সাই নগর থেকে এক গোছা সনেট্ লিখে বাংলা দেশে পাঠিয়েছিলেন। সেই কবিতাগুলি যদিও ফ্রান্সের ভার্সাই সহরে লেখা হয়েছিল, তবু তার শিকড় একদিকে যেমন ভারতবর্ষের কাব্য-শিল্প-সাধনার ঐতিহ্যে,—বাংলা দেশের আর্দ্রগন্ধ

মাটিতে আত্মবিস্তার করেছে,—অন্যদিকে তেমনি ছড়িয়েছে য়ুরোপের সূর্যকরোজ্জ্বল সেই প্রদেশে, দূর ইটালিতে। —যার সম্বন্ধে মধুসূদন লিখেছেন ঃ—

> "ইতালী বিখ্যাত দেশ, কাব্যের, কানন,
> বহু বিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে।"

এ দেশের সাহিত্যে চতুর্দশপদীর সেই প্রথম অপটু পদসঞ্চার। তারপর সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করে কতো ঘাসের ঘ্রাণ এবং সূর্যালোকের প্লাবনে, কতো তারকা-খচিত আকাশের স্তব্ধতায়ই না আমরা স্নান করে এলাম।

গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ

মোপাসাঁর গল্পের নায়ক-নায়িকার বর্ণনা প্রসঙ্গে আনাতোল ফ্রাঁস ছোট একটি ছড়ার উল্লেখ করেছিলেন :

And the little dolls
Run, run, run
Three times round
And then they are gone.

মোপাসাঁর গল্পগুলির মধ্যে ছড়িয়ে আছে ব্যর্থ কয়েকটি প্রাণী—ভাগ্যের হাতে পুতুলের মতো তারা অসহায় ; তারা আমাদের চোখের সামনে তু'দিনের জন্য দেখা দেয়, তাদের ব্যর্থতায়, তাদের গভীর হতাশায় আমাদের অভিভূত করে নিমিখেই তারা শেষ হয়। মোপাসাঁ সুনীতি সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা করেননা, অন্ধ-আতুরের জন্য সংকটত্রাণ সমিতি খোলবার পরামর্শও দেন না। ক্ষণিকের জন্য একটি ছবি দেখিয়েই তিনি অন্য ছবিতে মন দেন। তারপর···তারপর আর কি? আনাতোল বলেছেন "His indifference is equal to that of nature, it astonishes me, it irritates me."

গল্পগুচ্ছের পাঠকদেরও মনের কথাটি হচ্ছে এই। গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ গল্পের শেষে স্বতই বলতে হয়, "it astonishes me, it irritates me"। সাধারণ মেয়ের মুখ দিয়ে শরৎবাবুর কাছে রবীন্দ্রনাথের আবেদনটি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। কিন্তু সাধারণ মেয়ে অসামান্যা নয়; তাই তার জিৎ হোক ভাবলেই জিৎ হয় না। অনেক পরাজয়ের ইতিহাস তার চোখে-মুখে, তাইতেই তার সৌন্দর্য। সে যা, সে তাই।

ছোট গল্পের আঙ্গিকের প্রধান দুটি বিশেষত্বের একটি হলো এই objective বা নৈরাত্ম দৃষ্টিভঙ্গী; দ্বিতীয়টি গল্পের বক্তব্য ও পরিমাপ নির্দেশক। Edgar Allan Poe লিখেছিলেন, আধ ঘণ্টা থেকে দুঘণ্টার মধ্যে পড়ে শেষ করা যায়, এমন একটি কাহিনীই ছোটো গল্পের উপযোগী। জীবনের বিশেষ একটি ঘটনা, মনের বিশেষ একটি ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে হবে নাটকীয় রীতিতে— এই হলো ছোট গল্পের আদর্শ।

'গল্পগুচ্ছের' গল্পগুলির মধ্যে এই আদর্শের নিখুঁৎ প্রকাশ চোখে পড়ে! কিন্তু সেইটেই বড়ো কথা নয়। মনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ তার মননে, তার সৃষ্টিতে। সেই শক্তিতেই সৈন্যের চেয়ে সম্রাট বড়ো, তোতাপাখীর চেয়ে

মানুষ এবং সাধারণের চেয়ে প্রতিভাবান। এই সব গল্পে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার আশ্চর্য প্রসার আমাদের মুগ্ধ করে। বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের জীর্ণ এক ইস্কুলের নগণ্য পণ্ডিত যে গল্পের নায়ক হতে পারে, এমন অদ্ভুত কথা গল্পগুচ্ছ পড়বার আগে কেউ বা বিশ্বাস করতো ? নিতান্ত সাধারণ, এবং অতিশয় সামান্যের মধ্যে অসামান্যের আবির্ভাব দেখা গেল এই গল্পগুলিতে। 'একরাত্রি,' 'পোষ্টমাষ্টার,' 'মাষ্টার মশায়'—আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বের এই লেখা-গুলি অতীতের এক উজ্জ্বল বিদ্রোহের মতোই আকস্মিক। ধ্বংসোন্মুখ জমিদারি অথবা প্রাচীন ইতিহাসের অর্ধকল্পিত পরিবেশ থেকে বাঙালী পাঠকের মনকে একেবারে নীচের তলায় টেনে আনা কম কৃতিত্বের কথা নয়। বাঙালীর জীবনে বৈচিত্র্য নেই, রহস্য নেই, রোমাঞ্চ নেই,—'দক্ষিণে সুন্দরবন, উত্তরে তৈরাই,'—তারই মাঝে সমতল, মসৃণ, উর্বর এই পল্লীশ্রী আমাদের একমাত্র সম্পদ,—এমন একটি অভিযোগ আজও শুনতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এ অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। গ্রামের মাটি এবং মায়ের স্নেহেই আমরা মানুষ হই, সুতরাং গুরুতর রোগের ঝোঁকে প্রলাপের মধ্যে ফটিকচরণ যখন কলকাতা থেকে গ্রামে ফেরবার জন্য ছুটি চায়, তখন তার

মানে বুঝতে পাঠকের এক মুহূর্তও দেরি হয় না। তবু উত্তেজনাও কি এ জীবনে কম ? বৈদ্যনাথের মতো নিস্পৃহ, শান্তশিষ্ট লোকটিকেও শেষ পর্যন্ত 'স্বর্ণমৃগের' সন্ধানে বের হতে হয়। ছড়ি এবং ছিপ তৈরী করে জীবনের যে নিরুপদ্রব ধারাটি বয়ে চলেছিলো তা' থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে সে একদিন ছিটকে পড়লো দৈবধনলাভের উচ্চাশায়। কাশীর পোড়ো বাড়ীর নীচে গঙ্গার স্রোত,—সেখানে শিকলে বাঁধা শূন্য তামার হাড়ির অবিরাম আর্তনাদ, জলের নীচে মড়ার মাথা। বৈদ্যনাথের এই অভিযান কি তুচ্ছ ? এতো বড়ো হতাশা কি ফিকে ? আমাদের জীবনের এই চাঞ্চল্য, এই সংঘাতের পরিচয় পাওয়া গেল রবীন্দ্রনাথের রচনায়।

Stevenson গল্পের তিনটি শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন—আখ্যান-প্রধান, আবহ-প্রধান এবং মনস্তত্ব-প্রধান। রবীন্দ্রনাথ নিছক আখ্যানের জন্য অবশ্য কোনো গল্প লেখেন নি। (কোনো লেখকই বোধ হয় লেখেন না)। যে সব গল্পে আখ্যান দীর্ঘ, যেমন ধরা যায় 'রাসমণির ছেলে,' 'নষ্টনীড়,' 'স্ত্রীর পত্র,'—সেখানেও মনস্তত্বের দিকে তাঁর ঝোঁক দেখা যায়। কাহিনীর চেয়ে চরিত্রই বেশী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শানিয়াড়ির চৌধুরী-বংশের

উত্থানপতনের পটের উপর দু'একটি মুখের উজ্জ্বল প্রতিকৃতি ফোটে। কালিপদ এবং ভবাণীচরণ, শৈলেন এবং রাসমণি আমাদের মনে বেশ খানিকটা নাড়া দিয়ে যায়। 'স্ত্রীর-পত্র' শুধু অভিনব আঙ্গিকের জন্যই স্মরণীয় নয়। মেজবৌ শ্রীক্ষেত্র থেকে স্বামীব কাছে চিঠি লিখেছেন; সাতাশ-নম্বর মাখন বড়াল লেনেব একটি রূপহীনা মেয়ের সহিষ্ণুতা থেকে সকলেব অগোচরে মেজ-বৌ-এরই মনে লেগেছে বিদ্রোহের আগুন। বাংলা দেশের এই নিতান্ত সাধারণ অন্তঃপুরের এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি মাত্র প্রদেশেই পাওয়া যায়—সে হলো তাঁর ছোটো গল্প। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যেমন 'পোড়াকাঠ', রবীন্দ্রনাথের গল্পে তেমনি 'বিন্দু'। বিন্দুর শাড়ীতে শেষ পর্যন্ত আগুন লাগে, আমরা অভিভূত হই। আনাতোল ফ্রাঁসের সঙ্গে বলি, 'হায় রে পুতুল'; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বলি,

'তবে পরাণে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!'

বাংলা সাহিত্যে পুরুষ-চরিত্র ভালো ফোটেনি,—কথাটি রবিবাবুই একবার বলেছিলেন। 'গল্পগুচ্ছে' চোখ-ঝলসানো মেয়ের সংখ্যাই বেশী। এর কারণ বোধ হয় এই যে, বাঙালী পুরুষের মন প্রায়শঃই শিশুমনের

হ্রস্ব-দীর্ঘ সংস্করণ—কর্মবিমুখ এবং পরমুখাপেক্ষী। পক্ষান্তরে এদেশে অন্তঃপুরের হাজার নিগড়বেষ্টিত হয়েও মেয়েরাই ছিলেন জীবনের প্রস্রবণ। অন্তঃপুরকে কেন্দ্রে রেখেই এ দেশের সমস্ত চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছে। 'চতুরঙ্গে' ননীবালার নিষ্ঠা, দামিনীর বিদ্রোহ; 'স্ত্রীর পত্রে' বিন্দুর সহিষ্ণুতা, মেজবৌ-এর বিদ্রোহ; 'কঙ্কাল' গল্পে আর এক বিদ্রোহিনীকে দেখা যায়, নিস্বার্থ আত্মদানে যার অনাস্থা।

'বিচারক' এবং 'পুত্রযজ্ঞের' মধ্যে অবৈধ প্রণয়ের কথা আছে। বাংলাদেশে পতিতাদের নিয়ে গল্প লেখার সূত্রপাত শরৎচন্দ্রেই—এমন একটি সহজ বিশ্বাস আজকাল অনেকেই পোষণ করেন, দেখা গেছে। অবশ্য শরৎচন্দ্র ছিলেন উপন্যাসের সম্রাট। কিন্তু বিষয়বস্তুরই যদি কথা ওঠে, তা'হলে এই প্রসঙ্গে, শরৎচন্দ্রের পূর্বগামীদের মধ্যে অনেককেই স্মরণ করতে হয়। এবং রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' গল্পে যে দরদ, সংক্ষিপ্ত বর্ণনার যে নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি যে নৈরাশ্য দৃষ্টিভঙ্গী দেখা গেছে, শরৎচন্দ্রের একাধিক পতিতাজীবনীর ফলশ্রুতির সঙ্গে তা তুলনীয়; এ যুগের শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' তারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। শরৎবাবুর গল্পে-উপন্যাসে অবশ্য

খুঁটিনাটির বাহুল্য আছে—এই অর্থে তিনি রিয়্যালিষ্ট ; প্রেমেন্দ্র মিত্র শরৎচন্দ্রের মতো অবিমিশ্র আবেগধর্মী নন, তিনি চতুর অথচ হৃদয়বান ; রবীন্দ্রনাথের গল্পে চাতুর্য আছে, হৃদয় আছে এবং কবিত্বও আছে। মোপাসাঁ সম্বন্ধে ক্রোচে লিখেছিলেন, He distinguishes himself and emerges from the company of his contemporaries and compatriots, the Zolas, Daudets and their like, themselves endowed with noteworthy qualities and possessors of certain artistic forms but fundamentally and essentially poetical like him. । রবীন্দ্রনাথের গল্পেও সেই রকম গীতিকাব্যের হাওয়া বয়।

'Religion of Man"-এ কবি এক জায়গায় প্রশ্ন করেছেন, আর্ট বলি কা'কে ? উত্তরে লিখেছেন, 'It is the response of Man's creative soul to the call of the Real.' । আন্তরিকতাকে কবি যে কী মূল্য দেন, এ থেকেই তা' বোঝা যায়। অনন্নুভূত সামাজিক কর্তব্যজ্ঞানের তাগিদে বাংলাদেশে সম্প্রতি নতুনতম যে লেখক-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে, তাঁরা এখানকার কোলাহলমুখর গোধূলির স্বল্পালোকে দাঁড়িয়ে একবার দিগন্তের অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে দেখুন। কর্তব্যজ্ঞানটা ছোট কথা। সে আছে পুলিস কনষ্টেবলের। পক্ষান্তরে কর্তব্যবোধ পৃথিবীতে

অত্যন্ত বিরল, তা'তে কর্তব্যের ভার নেই, অথচ মধুর নিষ্ঠা এবং পরম আত্মসমর্পণ—দুই-ই আছে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় আন্তরিকতার অভাব কোথাও নেই। তিনি সমাজের যে স্তরের অধিবাসী, তার বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি চলে এবং সে দৃষ্টি এতোটুকু ঝাপসা নয়। এবং প্রসঙ্গবিশেষে অতি-মনোযোগ বা obsession-এর দোষও তাঁর নেই। তাঁর মন সজীব, সুতরাং তাঁর কৌতূহলও ব্যাপক। গল্পগুচ্ছে বালকের চাপল্য এবং প্রৌঢ়ের জল্পনা, দরিদ্রের অশ্রু এবং ধনবানের অপব্যয়, কুমারীর অনুরাগ এবং বিধবার প্রেম,—সবই আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কোথাও অতিনিবদ্ধ নয়,—যে দোষের প্রকাশ ঘটেছে শৈলজানন্দের মাতৃত্বচিত্রণে এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বাভাবিকতা-প্রীতিতে। তবে বিশেষের চেয়ে সাধারণ এবং প্রাদেশিকতার চেয়ে বিশ্বমানবমনের ছবিই তাঁর কয়েকটি গল্পে বেশি ফুটে উঠেছে। 'কাবুলি-ওয়ালা' নিগ্রো হলেও ক্ষতি ছিলনা এবং ভূটানী হলেও গল্প ঠিক থাকতো। কারণ, ওর মধ্যে কাবুলের ভূবৃত্তান্ত, সামাজিক রীতি-নীতি, জীবনধারণের পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় গৌণ; মুখ্য বিষয় হচ্ছে একটি শিশুর মনে সুদূরের কৌতূহল এবং একটি সন্তানবৎসল প্রবাসীর পিতৃত্ববোধ।

চেকভের স্মৃতি-সঞ্চয়ে দেখা যায়, গল্পের নামকরণ সম্বন্ধে তিনি নাকি বড়ো খুঁৎখুঁতে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য গল্পটি তাঁর হাতে পড়লে, তিনি হয়তো ওর শিরোনামা কেটে লিখতেন 'পিতা'। 'একটা আষাঢ়ে গল্পে'-তে সর্বজনীনতার নিদর্শন মেলে। তাসের দেশ কোনো প্রাদেশিকতার সীমানায় বাঁধা নেই, বিপুলা পৃথ্বীর একাধিক ভূখণ্ডে এর দর্শন লাভ ঘটে। নামের অপপ্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের আর একটি গল্পসম্পর্কে উল্লেখ করা যায়—'দৃষ্টিদান'। দৃষ্টিদানের সিদ্ধান্ত বলতে যা বুঝি, সে হলো এই যে, যে মেয়েকে ভালোবাসো, মনে রেখো সে দেবী নয়, সে মানবী। নিজের দৃষ্টি যে মেয়ে স্বামীকে দান করলো, অপরের সঙ্গে স্বামীব শুভদৃষ্টি-বিনিময়ের বাধা ঘটালো সে-ই। প্রেমের জন্যই সে স্বার্থপর। সে দেবী নয়, মানবী। চেকভ বোধ হয় ও গল্পের নাম রাখতেন 'দেবী না মানবী?' অথবা 'পরিচয়' অথবা ঐ রকম অন্য একটা কিছু।

মানুষের মনের অতলে কতো অতৃপ্তি, কী বিচিত্র বুভুক্ষা! অনেক জিনিস আমাদের চোখেই পড়ে না। হঠাৎ, কিছু একটা আশ্চর্য ব্যাপার যখনই ঘটে, তখন মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ে প্রচ্ছন্ন সত্য। 'দিদি' গল্পটিতে এমনি একটি কাহিনী আছে। 'আপদ' আর একটি উদাহরণ। একটা

ভবঘুরে ছেলে প্রথমে আশ্রয় পেলো, তারপর গৃহিণীর কাছে মায়ের মতো স্নেহ পেলো—এবং তারপর, কী আশ্চর্য, সেই নির্বোধ অভিমান করে ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিলো।—এই হচ্ছে 'আপদের' মোট কথা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'ডবল ডেকারে' 'অপূর্ণ' নামে যে গল্পটি প্রকাশ করেছেন, প্রসঙ্গক্রমে সেটি মনে পড়ছে। 'অপূর্ণ' 'আপদের-ই' অন্য সংস্করণ। আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গল্পের নাম 'পয়লা নম্বর'। প্রমথ চৌধুরীর গল্পের মধ্যে আমরা ঋজু, সংযত, উদ্দীপ্ত যে ভাষাবিন্যাসের পরিচয় পাই এবং যাতে একমাত্র প্রমথ চৌধুরীর নিজস্ব শীলমোহরের ছাপ পড়েছে, সেই লিখনরীতির প্রয়োগ দেখা যায় 'পয়লা নম্বরে'। আর মনে হয় সিতাংশু মৌলি একেবারে এ কালের লোক—এই 'শেষের কবিতা', 'মালঞ্চ', 'দুই বোন' এর যুগের মানুষ।

কিন্তু গল্পগুচ্ছের সব চেয়ে চমকপ্রদ গল্পগুলি কোন্ শ্রেণীতে পড়ে, এ প্রশ্ন আমাকে যদি কেউ করেন, তাহলে আবহপ্রধান গল্পগুলির উল্লেখ করা দরকার। 'ক্ষুধিত পাষাণ,' 'নিশীথে' প্রভৃতি গল্পগুলির তুলনা বাংলা সাহিত্যে একমাত্র শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রেমেন্দ্র

মিশ্রির কয়েকটি গল্পে ছাড়া আর কোথাও কি পাওয়া যায়? এই আবহসৃষ্টির নৈপুণ্য রবীন্দ্রনাথের একাধিক গল্পে দেখা যায়। এমন কি 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কাহিনী', প্রভৃতি নতুন ধরণের চিত্রধর্মী গল্পগুলিতেও এই ঝোঁকটা রয়ে গেছে। এদের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে 'লিপিকার' কয়েকটি রচনার। দৃষ্টান্তের জন্য 'পুরোনো বাড়ি-র' উল্লেখ করা চলে। কিন্তু 'পুরোনো বাড়ি'তে কবিকেই বেশী চোখে পড়ে, গল্পলেখককে কম। 'ঘাটের কথায়' কবি এবং গল্পলেখকের সমবেত প্রচেষ্টায় একখানি ছবি আঁকা হয়েছে। পরবর্তী কালে এই ধারাটির প্রকাশ দেখি বুদ্ধদেব বসুর 'রেখাচিত্রে'। বুদ্ধদেব বাবু রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করলেও 'রেখাচিত্রে' এই আঙ্গিকের রূপান্তর ঘটেছে এবং বহির্জগৎ থেকে তাঁর দৃষ্টি অনেকটা সরে গিয়ে অন্তর্মুখী হয়েছে। তাঁর 'জ্বর' 'মেজাজ' প্রভৃতি গল্পগুলি রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত আঙ্গিক অনুসরণ করলেও মৌলিক এবং উপাদেয় এবং সেখানে বুদ্ধদেব বসুর-ই ছাপ আছে।

অবিমিশ্র গুরু বিষয়ের পক্ষপাতী অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নন। তিনি হাসির গল্পও লিখেছেন এবং অন্য ধরণের গল্পেও প্রচুর হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। 'মুক্তির

উপায়'-এর comedy of errors আমাদের নির্মল আনন্দ দেয়। 'অধ্যাপক'-গল্পটিতে অনন্ত আকাশ সম্বন্ধে মহীন্দ্র-কুমারের বিতর্ক-বুভুক্ষা অথবা 'ভাইফোঁটা'-য় ডিরোজিও-র ছাত্র সনাতন দত্তের সত্যনিষ্ঠার প্রসঙ্গ গভীর বেদনার মধ্যেও আমাদের মনে হাসির উদ্রেক করে।

চেকভের গল্প পড়ে গর্কি বলেছিলেন, এ যেন শরৎ-কালের এক বিষণ্ণ বিকেল। আর রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে দেখা গেল পরিপূর্ণ একটি পৃথিবী,—হাসিতে-কান্নায়, শোকে-আনন্দে, কথায়-নীরবতায়, ত্যাগে-স্বার্থপরতায়, মৃত্যুতে-অমরতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি মানুষ; তাদের চারিদিকে দিনরাত্রির সনাতন লীলা, তাদের মাথার উপর অনন্ত আকাশের নীল, সেখানে কিছুই দেখা যায় না, শুধু অদৃশ্য এক বিধাতার অক্লান্ত হাত নিরন্তর তাদের জীবনের পট পরিবর্তন করে,—সেই হাত ঋজু আর বলিষ্ঠ, সেই বিধাতা রসিক এবং নির্মম—গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ।

আর্যধর্মী রবীন্দ্রনাথ

কার্লাইল এক জায়গায় বলেছেন, ইতিহাস হলো বহু জীবনের মিলিত কাহিনী। অর্থাৎ বিশেষ একখানি জীবনীতে যেমন বিশেষ একটি জীবনের চিত্র ফুটে ওঠে, ইতিহাসে তেমনি এক পাত্রে অসংখ্য জীবনের সাধারণ রূপটাই পরিবেশিত হয়। কার্লাইলের এই কথাটিকে অবলম্বন করে আর একটু যদি এগিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ-কালের বিভিন্ন মহাপুরুষদের অসীম নীহারিকার অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন দীপ্তিকেন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা চলে। মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অনন্ত নীহারিকা প্রাণের পূর্বাঞ্চল থেকে প্রাণাতীত অসীমতায় প্রসারিত, সেই আলোক-প্রান্তরে মাঝে মাঝে এমনি ঔজ্জ্বল্যের নিবিড়তা অবাধ্য চাঞ্চল্যের অতীত ছন্দোময় সৌষম্যের সম্ভাবনা নির্দেশ করে। মানব-সভ্যতার নভোমণ্ডলে রবীন্দ্রনাথ এমনি একটি দূরপ্লাবী দীপ্তিসূত্র। 'মানব-সভ্যতা' কথাটা অবশ্য অত্যন্ত ব্যাপক। পৃথিবীর নানা প্রাদেশিকতা এর মধ্যে নিহিত। বাংলাদেশের কবি বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি ডিঙ্গিয়ে কোনো আকাশবর্তী

অতিথিকে যে আলিঙ্গন করেন নি, একথা বলা বাহুল্য। যে জলধারা মেঘলোক থেকে নেমে আসে, তার মধ্যে সারা পৃথিবীর সংযোগ আছে, তবু কোনো প্রাচীরেই সে আবদ্ধ নয়। বাংলার ধ্যান-ধারণা তেমনি রবীন্দ্র-প্রতিভার উত্তাপে বিশ্ববাসনালোকে উন্নীত হয়েছে। বিশ্বভারতীর পরিকল্পনায় এই সম্মেলনের আদর্শই রূপায়িত।

ভারতবর্ষের মজ্জায় এই সমন্বয়বাসনার অবস্থান। ইতিহাসের সাক্ষ্যে নির্ভর করে বলা যায়, এ হলো সেই দেশ,—'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ং।' আর্য-অনার্যের মিশ্রিত রক্ত এর ধমনীতে প্রবাহিত। শক-হূন-মোগল-পাঠান-ইংরেজ—নানা জাতিকে এ দেশ প্রলুব্ধ করেছে, নানা সভ্যতাকে আত্মসাৎ করে, নানা প্রভাব উত্তীর্ণ হয়ে এর প্রাণস্রোত অনির্দেশ্য সার্থকতার সীমান্তমুখে বয়ে চলেছে।

এই প্রকৃতি হলো আর্যপ্রকৃতি। 'আর্য' কথাটির মূলে আছে সংস্কৃত 'ঋ'-ধাতু, যার মানে গমন করা। আর্যরা ছিলেন গতিশীল। বিচিত্র মানস-ব্যবহারে তাঁদের কৌতূহল ছিল চিরউদ্যত। মধ্য-এশিয়ার মরুভূমি অতিক্রম করে পাঞ্জাবের নদীতটদেশে বসতি স্থাপন করেই তাঁরা শ্রান্ত হয়ে যান নি। ক্রমশঃ পূর্বাঞ্চলে তাঁদের প্রসার ঘটেছে। গোঁড়ারা নিন্দা করে চলেছে, ব্রাত্য।

দ্রাবিড় রক্ত, মোঙ্গল রক্ত এবং আর্যরক্তের ত্রিবেণীতে গড়ে উঠেছে নতুন দেশ, নতুন সভ্যতা, নতুন সন্তান। বৈদিক ভাষার শৃঙ্খল কেটে অচলায়তনের বাইরে দাঁড়িয়েছে প্রাকৃত। মহারাষ্ট্রে তার এক রূপ, শূরসেন প্রদেশে অন্য, মগধে আবার অন্যতর রূপ। অনার্য মন স্বভাবতঃই স্থিতিধর্মী। তার চারিদিকে সংস্কারের বোঝা। সে বহির্ভীরু। তার কৌতূহল থাকলেও বোধব্যাপ্তিসাধনের সামর্থ্য নেই। ক্রমশঃ বাইরের তাড়া খেয়ে সে অন্তঃপুরের মধ্যে অন্তঃপুর তৈরী করে। তারপর একদিন দীর্ঘ অবরোধের জীর্ণতা ধরা পড়ে প্রত্নতাত্ত্বিকের চোখে। তখন অন্ধকার গুহান্তরাল থেকে অবসিত জীবনের অস্থি-পঞ্জর উত্তোলিত হয়।

আমাদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই রকম সংস্কারান্ধ অনার্যের বসতি। সিদ্ধাচার্যদের গান থেকে আরম্ভ করে মঙ্গলকাব্য, নাথগাথা, এবং ভারত-চন্দ্র অবধি যে দৃষ্টি চোখে পড়ে, তার প্রকৃতি দ্বৈপায়ন। তারপর উনবিংশ শতকের জোয়ারে ওয়েলেস্‌লির সঙ্গে যখন ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজেরও আবির্ভাব ঘটলো, তখন থেকে একটা অন্যতর হাওয়ার ছোঁয়া লেগেছে। রামমোহন রায় হলেন এই সময়ের লোক।

আমাদের সাহিত্যের আদিপর্ব থেকে আধুনিক প্রহরাবধি যতো মনের খবব পাওয়া যায়, তার মধ্যে বামমোহনই পূর্বোক্ত অর্থে প্রথম আর্যমনেব সংক্রান্ত আনলেন। তাঁর আবির্ভাব বাধানগব গ্রামে, তিবোভাব ঘটেছিল ব্রিস্টলে। দেশেব সঙ্গে বিদেশেব যোগ তাঁব চোখে সহজেই ধবা পড়েছিল। সে সময়ে শুচিবায়ুগ্রস্ত গোঁড়া হিন্দু খ্রীষ্টানীব স্পর্শভয়ে কাতর। আব শ্বেতচর্ম খ্রীষ্টান যাজক হিন্দুয়ানীব মান-মর্যাদা হবণ কববার জন্য কৃতসংকল্প। বামমোহন নিজেব প্রতিভাকে সম্মার্জনীব মতো ব্যবহাব করেছিলেন। কুসংস্কাবেব বোঝা যেখানেই তিনি জমতে দেখেছেন, সেখানেই নির্দয় শক্তিতে তা' অপসারিত করবাব চেষ্টা করেছেন। একেশ্ববাদী বামমোহন স্মার্ত হিন্দুসমাজেব বিরুদ্ধে এক আশ্চর্য প্রতিক্রিয়াব প্রতিমূর্তি মাত্র।

রামমোহনেব পরে এই নতুন হাওয়া দেশের বহু স্থলে প্রবাহিত হতে সুরু করেছে। হেমচন্দ্র,—নবীনচন্দ্র,—মধুসূদনের কাব্যে প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে একটা ঘনিষ্ঠতাব পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য শিক্ষিত শ্রেণীব মধ্যেই এই ঘনিষ্ঠতা তখন স্বীকৃত হয়েছে। শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কারের নব্য আন্দোলন

প্রবর্তিত করেছেন। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রোম্যান্সে' দূরত্বের সহজ অনুরাগ দেখা যায়। কিন্তু ভারত-বর্ষের ত্রিসীমানা ছাড়িয়ে সমুদ্রপারবর্তী কোনো জাতি, সভ্যতা বা সংস্কৃতিকে তিনি কোনোদিনই খুব কাছে ঘেঁষতে দেন নি। রামমোহনের একেশ্বরবাদিতা এবং বঙ্কিমের কৃষ্ণ-চরিত্রের অতিমানবত্বে আস্থা—এ দুইই বিতর্ক-উপজিত কিন্তু প্রত্যয়ীভূত। দু'জনেই দেশানুরাগী ছিলেন। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় দু'জনেই সমধর্মী। কিন্তু প্রকৃত integrity বা আত্মস্থতা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতির শৃঙ্খলে বহুধা আবদ্ধ ছিলেন। রাজনৈতিক-সামাজিক কারণেই হয়তো এ ব্যাপার সম্ভব হয়েছিল। বৈদেশিক শাসনের অধীনস্থ দেশের আত্মবোধের প্রথম জাগরণ সময়ে উগ্র দেশাত্মবোধই সম্ভব। 'বন্দেমাতরম্' তাই কেবলমাত্র ভারতমাতার প্রতি উদ্দিষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে এই নিখিলভারতবোধও প্রায় অজ্ঞাত ছিল। কোম্‌টে, মিল্, বেন্থাম্, হার্বার্ট্ স্পেন্সার প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীদের দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষপাতিত্ব ছিল হিন্দুস্থানের প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির উপর। তাঁর প্রাদেশিক মনোবৃত্তির দৃষ্টান্ত খুঁজে বের করবার জন্য গবেষণার প্রয়োজন নেই। বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রসঙ্গে এই সব উক্তি অবশ্য শক্তিমান যুগস্রষ্টার

প্রতি ব্যাঙ্গোক্তি নয়। পক্ষান্তরে তাঁর উদ্দেশে সশ্রদ্ধ নতি জ্ঞাপন করেও সমালোচকের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন স্বাদেশিকতায় দীক্ষিত। বাইরের জিনিসকে ঘরে তোলবার আগ্রহ তাঁর ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ঘরের প্রাচীর না ভাঙ্গে, এ দিকেও তাঁর মনোযোগ ছিল উদ্যত।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাত থেকে রবীন্দ্রনাথেব হাতে যখন দেশের মনের চাবিকাঠি এসে পৌঁছালো, তখন ভারতবর্ষে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন সুরু হয়ে গেছে। ব্রাহ্ম ধর্মের বিপ্লব থেকেই বোধহয় এই সংঘবদ্ধ আন্দোলনেব আরম্ভ। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের নেতা মাধবগোবিন্দ রাণাডে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে লেখা একখানি চিঠিতে নিজেকে ব্রাহ্ম আন্দোলনের দীন কর্মী হিসাবে পরিচিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই রাণাডে জাতীয় কংগ্রেসের একজন পুরোধা হয়েছিলেন। সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ যখন লেখক-জীবনের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করলেন, তখনো ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসভা 'স্বরাজ'-এর দাবী উত্থাপন করেনি। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ অবধি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে শাসন-সংস্কারেব দাবী উত্থাপন করাই কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল। বঙ্গভঙ্গ

আন্দোলনের সময়ে ১৯০৬ সালে প্রথম 'স্বরাজ' শব্দটি ভারতের জাতীর সংগ্রামের লক্ষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হলো। রবীন্দ্রনাথ যে আবহে লালিত হয়েছিলেন, সেই পরিবেষ্টনীর মধ্যে স্বরাজের মূল বৈশিষ্ট্যের দাবী কিন্তু ইতঃপূর্বে উচ্চারিত হয়ে গেছে। ১৮৬৭ সালে নবগোপাল মিত্রের প্রচেষ্টায় এবং ঠাকুর পরিবারের সহযোগিতায় প্রথম 'হিন্দু-মেলা'র অনুষ্ঠান হয়। 'হিন্দু মেলায়' স্বদেশী পণ্যের বহুল প্রচার-চেষ্টা সাধিত হয়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক স্বায়ত্ত শাসনই যে সত্যিকার 'স্বরাজ', এ কথাটা বাংলা দেশে আগেই প্রচারিত হয়েছে। ১৯০৫—৬ সালে 'রাখীবন্ধন'-আন্দোলনের প্রায় একই সময়ে 'বিদেশী-বর্জন' আন্দোলনও বাংলা দেশেই অনুসৃত হয়। এই উগ্র জাতীয়তাবোধের পারি-পার্শ্বিকতা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকে কিন্তু কোনোদিন ঝাপসা করেনি। তিনি জাতীয়তার চেয়ে আন্তর্জাতিকতার পক্ষপাতী ছিলেন। বদ্ধ জলাশয়ের জলে তাঁর কোনোদিনই অভিরুচি ছিলনা। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক লাভালাভের সম্ভাবনার বিচারে যাঁরা পথিনির্দেশ করেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অবশ্য সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করেননি,—কিন্তু একথা তিনি পুনঃপুনঃ বলেছেন যে 'স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যার অন্তর্গত এই কথাটা বর্তমান যুগের

অন্তর্নিহিত কথা।' * বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণের পার্থক্য এই তত্ত্বাশ্রিত।

যেমন গান্ধীজী, তেমনি রবীন্দ্রনাথ—দু'জনেই ঐক্য ও মিলনের আদর্শে আস্থাশীল। ভারতবর্ষ যেখানে বৈদেশিক লুণ্ঠননীতির দ্বারা অপমানিত, সেখানে দু'জনেব কণ্ঠেই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরে রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভূত নিন্দা করেছেন,—'স্যার'-উপাধি তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করেছেন। রাউলাট্-আইনেব প্রবর্তনে গান্ধীজীর প্রতিক্রিয়া ঠিক একই রকম। নোগুচির উদ্দেশে লেখা চিঠিতে এবং র‍্যাথ্‌বোনের অভিযোগের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে। তথাপি 'বিশ্বভারতীর' আদর্শে তাঁর প্রত্যয় কোনোদিন শিথিল হয়নি। তাঁর কবিতায়, গানে, গল্পে—সর্বত্র বাংলাদেশের মাটির গন্ধ, আকাশের ব্যাপ্তি! তবু অত্যন্ত অবলীলাক্রমে তিনি বলতে পেরেছেন, 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে।' 'শারদোৎসবের' উপনন্দ, 'অচলায়তনেব' পঞ্চক, 'ডাক-ঘবেব' অমল—মানবজাতির আত্মা এই সব বন্দী বালকের রূপকে তাঁর কাব্যে বারেবারে মুক্তি ভিক্ষা করেছে।

* রাশিযার চিঠি।

সুরঙ্গমা মধুরতার সূত্রে অন্ধ বাধা অতিক্রম করবার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। সেই মাধুর্য যেখানে লাঞ্ছিত, সভ্যতার সেইখানে মৃত্যু। তাই নব্য পৃথিবীর আধুনিক সভ্যতাকে লক্ষ্য করেই তিনি বোধ হয় বলেছিলেন, 'Civilisation must be judged and prized not by the amount of power it has developed, but by how much it has evolved and given expression to, by its laws and institutions, the love of humanity.' P

রবীন্দ্রনাথের জীবনে,—তাঁর চিন্তায়, কর্মে, সাধনায় সেই অদম্য কৌতূহলেরই প্রকাশ দেখা যায়, যার প্রেরণায় মধ্য এশিয়াব মরুভূমি অতিক্রম করে একদিন ভারতবর্ষের ছায়াচ্ছন্ন বনস্থলীতে আর্যজাতির সমাগম ঘটেছিল। তাঁরা প্রকৃতির উদার প্রসন্নতা নিজেদের রক্তস্রোতে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের ঋজুদেহ এবং প্রশস্ত ললাট, তাঁদের উন্নত নাসিকা এবং ধীর, গম্ভীর বাচনভঙ্গী সেদিন অবশ্যই এদেশেব প্রাক্তন অধিবাসীর মনে বিশেষ বিস্ময়ের সঞ্চার ঘটিয়ে থাকবে। তাঁদের অক্লান্ত পাদসঞ্চালনে সিন্ধুনদের তীর থেকে পথ তৈরী হলো পূর্বাভিমুখে,—উত্তরে,—

SADHANA.

দক্ষিণে। সেই সব পথে তাঁদের বিজয়োৎসবের শোভা-যাত্রা গিয়েছে বারে বারে। বাহুবল তাঁদের অবশ্যই ছিল, কিন্তু ততোধিক আরো একটি অস্ত্রের তাঁরা ছিলেন অধিকারী। সে হলো, শ্রেয়তর সংস্কৃতি। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর মানবসমাজকে সেই আর্যের অস্ত্রই আবার দিয়ে গেছেন। গান্ধীজীও তাই দিয়েছেন। এই জীর্ণ সভ্যতা সে অস্ত্র যদি গ্রহণ করে, তাহলে জাতীয়তার বদলে আন্তর্জাতিকতা নিয়েই আমাদের কর্তব্য শেষ হবে না— বুদ্ধের ধ্যান আমাদের অন্তরে উপলব্ধি করতে হবে। প্রতি মানুষকে বলতে হবে, 'ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি।' বুদ্ধদেবই রবীন্দ্রনাথের আরাধ্য।

ভক্তির কবিতা

বাংলা সাহিত্যে ভক্তিরসাত্মক কাব্যের অভাব নেই। বৈষ্ণব কাব্য, শাক্ত পদাবলী, বাউল গান ইত্যাদি রচনা কাব্যানুরাগী বাঙালি মাত্রেরই সুপরিচিত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই সব রচনার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং 'ভানুসিংহের পদাবলীতে' অপরিপক্ক কিশোরবৃত্তি যতোই না কেন প্রকাশিত হয়ে থাক, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি প্রভৃতি রচনা পরিণত কবিচিত্তের ভক্তিবোধের সুনিশ্চিত প্রমাণ রূপেই গ্রাহ্য।

একজন বিদেশী সমালোচক লিখেছিলেন যে ভক্তিরসাত্মক কাব্য "Like the height of tragedy is beyond the reach of oratory."। তাঁর অভিমত হলো এই যে, কবির মনে যদি ভক্তিভাবের ঐকান্তিক স্ফুরণই ঘটে, তাহলে তার আবার অলংকৃত উদ্ঘাটন কেন? ভক্তির আস্বাদনেই তো ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া উচিত। তার পরিবর্তে অলংকার, ব্যাকরণ ইত্যাদি শাস্ত্রের শাসন মেনে যদি কোনো ভক্ত সাজিয়ে গুছিয়ে কথা রচনা করতে বসেন, তাহলে তাঁর ভক্তির ফাঁকিটাই কি ধরা পড়ে না?

অর্থাৎ যে ভক্ত কবিতা লিখবেন, তিনি আগে ভক্ত না আগে কবি ?

সাধারণ বুদ্ধিতে এ প্রশ্নের জবাব হলো এই যে, কবির স্বভাব হলো কবিতা লেখা, আর ভক্তের লক্ষণ হলো ভক্তিভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়া। শেষের ব্যাপারটি যেখানে আত্মসিদ্ধ, সেখানে ভক্ত কেবল ভক্তই থেকে যান। আর যদি তাঁর স্বভাবই হয় কথার সঙ্গে কথা মেলানো, তাহলে ভক্তির প্রকাশ ঘটে কাব্যের চমৎ-কারিত্বে। আর কবিদের কাজই যেহেতু সাদৃশ্যের সন্ধান রাখা, সেজন্য ঈশ্বরের কথা থেকে অবলীলাক্রমে তাঁরা সামান্য মানুষের সংসারে নেমে আসতে পারেন। সেখান-কার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা তখন তাঁদের রচনায় মূর্তি-লাভ করে, যদিও তলে তলে একটা প্রবল ফল্গু স্রোত অবিচ্ছিন্ন ভাবে বয়ে যায়। এই স্রোত হলো ভক্তি-ভাবের স্রোত।

সংস্কৃতে অলংকার শাস্ত্রের একখানি বই-এ রসতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পানক বা সরবৎ এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সরবতে যেমন মরিচ, লবণ ইত্যাদি বিচিত্র স্বাদ থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত শর্করার স্বাদটাই প্রাধান্য লাভ করে, কাব্যবিশেষের আস্বাদনেও তেমনি বিভিন্ন

রসের সহযোগিতা চোখে পড়ে। এই সব পৃথক স্বাদের মধ্যে অন্য গুলির প্রাধান্য প্রারম্ভিক, আর মূল রসটির প্রাধান্য হলো পার্যন্তিক অর্থাৎ শেষ অবধি।

ভক্তিরসাত্মক কবিতার স্বাদ সম্বন্ধে এই পানকের দৃষ্টান্তটি সুপ্রযোজ্য। পানকের পার্যন্তিক স্বাদ যেমন শর্করার স্বাদ, ভক্তিরসাত্মক কবিতার পার্যন্তিক স্বাদ তেমনি ভক্তির স্বাদ। সংসারের সুখ-তুঃখেব কথা, শাস্ত্রের কথা, পাণ্ডিত্যের কথা, ইন্দ্রিয়-সুখের কথা,—এই সব থেকেও কাব্যে ভক্তির কথাই যখন প্রবলতম প্রকাশ লাভ করে, তখনই সে কাব্য হয় ভক্তির কাব্য।

সাধারণতঃ আলংকারিকদের রচনায় ভক্তিবস বলে ভক্তিপথের যে পাঁচটি স্তরবিভাগ সূচিত হয়ে থাকে, সেগুলি হলো যথাক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে ভক্তির প্রথম অবস্থাটাই হলো শমভাব। বসশাস্ত্রে এই শমভাবজাত শান্তরসের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তবে অনেকে আবার এই বস্তুটিকে পৃথক একটি রসের মর্যাদা দিতে স্বীকৃত হন নি। ভরতের পরবর্তী আলংকারিক অভিনব-গুপ্ত বলেছেন, প্রয়োগত্ব যেখানে নেই, কাব্যে রসাস্বাদ-ব্যাপারও সেখানে অসম্ভব। এই 'প্রয়োগত্ব' শব্দটির

মানে হলো 'Representableness'। শমভাব যেহেতু চিৎপ্রবৃত্তির বিশ্রামসূচক, সেই কারণে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এই ভাব প্রয়োগসাধ্য নয়। এর কোনো নাটকীয় অভিব্যক্তি নেই। অভিনবগুপ্ত তাই শান্তরসের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি।

'দশরূপকের' লেখক ধনঞ্জয় বলেছেন,

রত্যুৎসাহজুগুপ্সাঃ ক্রোধোঽহাসঃস্ময়োভয়ং শোকঃ।
শমমপি কেচিৎ প্রাহুঃ পুষ্টির্নাট্যেষু নৈতস্য ॥

—দশরূপক, ৪।৩৫।

অর্থাৎ রতি, উৎসাহ, জুগুপ্সা, ক্রোধ, হাস, বিস্ময়, ভয় এবং শোক ব্যতীত শমভাবকেও কোনে কোনো আলংকারিক স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু নাট্যে এর পুষ্টি নেই।

ধনঞ্জয়ের এই উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে টীকাকার ধনিক বলেছেন,

আচার্য যেহেতু অন্যান্য ভাবের বিভাবাদি আলোচনা করলেও শান্তরসের অনুরূপ কোনও আলোচনা করেননি, এবং অনাদিকাল প্রবাহে যে রাগ-দ্বেষের তাড়নায় অন্যান্য ভাবের প্রকাশ, সেই রাগ-দ্বেষই যখন শমভাবে অস্বীকৃত, তখন শমভাবের অস্তিত্ব রসশাস্ত্রের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করবে কি ভাবে?

সুতরাং দেখা গেলো, অভিনবগুপ্ত কার্যোল্লেখে যা বলেছিলেন, ধনিক কারণোল্লেখে তাই বললেন। অভিনবগুপ্ত প্রয়োগত্ব ক্ষমতাকে রসত্বের নির্ণায়ক বলে স্বীকার করেছিলেন, আর ধনিক বললেন, শান্তরসের মূলে তেমন কোনো ভাব নেই, তেমন কোনো কারণ নেই যা অনাদিকালপ্রবাহে মানবচিত্তে নেতিবাচক ভাবে নয়, স্পষ্ট প্রেরণায় কর্মের তাগিদ জানিয়েছে।

'সাহিত্যদর্পণে' বিশ্বনাথ বলেছেন,

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সাবিস্ময়শ্চেটেত্যষ্টৌ প্রোক্তাঃ শমোঽপিচ ॥

—সাহিত্যদর্পণ, ৩।১৭৯।

এখানেও দেখা যাচ্ছে, প্রথমে আটটি ভাবের উল্লেখ করে শেষে শমের উল্লেখ করা হয়েছে। এই শমভাবের বর্ণনায় আবার বিশ্বনাথ বলেছেন,

শমো নিরীহাবস্থায়াং স্বাত্মবিশ্রামজং সুখং

—সাহিত্যদর্পণ, ৩।১৮০।

পূর্বোল্লিখিত অন্যান্য আলোচনায় যে কথাটি অস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছিল, বিশ্বনাথের এই একটি মাত্র উক্তিতে সেটি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হলো। নিরীহাবস্থায় আত্মার বিশ্রামে যে সুখবোধ, তাই হলো শমভাব। যতো নিরীহ,

স্তিমিত এবং অনুচ্চারিতই হোক না কেন, এই বোধ যে সুখের বোধ, সে কথা বিশ্বনাথেব প্রসাদে আমরা জানতে পারছি। সুতরাং ভক্তির কবিতার মূলে সুখের প্রেরণা যে কোথা থেকে আসে, তা বোঝা গেল। শমভাবগ্রস্ত ভক্ত পরম সুখময়তায় আচ্ছন্ন হন, তারপর সেই চিত্ত যদি আবার কবির অধিকারভুক্ত হয়, তাহলে এই সুখবোধ কাব্যে আত্মপ্রকাশ ঘটায়।

'কাব্য-প্রদীপের' লেখক গোবিন্দ ঠক্কুর শমভাবের মধ্যস্থতা না মেনে সরাসরি ভক্তিরস বলে একটি স্বতন্ত্র রসের অস্তিত্ব মেনে নিয়েছের্ন। তিনি বলেছেন কা'রও মতে রস বলতে একমাত্র শৃঙ্গার বা আদিরসই ধর্তব্য আবার অন্যান্যদের মতে রস বারো রকম,—"কোচিচ্চ দ্বাদশ" ইত্যাদি।

এই দ্বাদশ রসের উল্লেখকালে বৈদ্যনাথ উপাধ্যায় বলেছেন,

"ভক্তিবাৎসল্য শ্রদ্ধাখ্যৈস্ত্রিভিঃ সহিতাঃ
শৃঙ্গারাদয়োনবেত্যর্থঃ।"

ভক্তি, বাৎসল্য এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে শৃঙ্গার প্রভৃতি নব রসের যোগে সর্বসমেত রস দ্বাদশ সংখ্যক। দেখা যাচ্ছে, এখানে শান্তরসকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়ে ভক্তি, বাৎসল্য এবং

শ্রদ্ধাকে রসপর্যায়ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। মম্মট ভট্ট বলেছেন,

নির্বেদস্থায়িভাবাখ্যঃ শান্তোঽপি নবমোরসঃ।

রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঞ্জিতঃ ভাব প্রোক্তঃ॥

—কাব্য প্রকাশ ৪।১২।

অর্থাৎ নবম রসের নাম শান্তরস; নির্বেদ এর স্থায়ীভাব ইত্যাদি।

এই অংশের টীকায় অবশ্য টীকাকার গোবিন্দ ঠক্কুর একথা মানেন নি। তিনি বলেছেন, শান্তরসের স্থায়ী-ভাব হলো সর্ববৃত্তির বিরাম। নির্বেদ এর ব্যভিচারী ভাব।

সংস্কৃত রসশাস্ত্রের ছাত্র এই রকম আলোচনার প্রাচুর্যে নিমজ্জিত হতে পারেন। এ জাতীয় উক্তি-প্রত্যুক্তির যেন অন্ত নেই। সেই বিতর্ক-জালের জটিলতায় অধিকতর পর্যটনের অবশ্য পুরস্কার আছে। কিন্তু আপাততঃ যে আলোচনা এখানে উদ্ধৃত হলো, তা'থেকে এই কথাটি নিঃসংশয়ে বোধগম্য হয় যে ভক্তির প্রভাবে মানুষের মনে সর্বপ্রকার চিৎপ্রবৃত্তির বিরামজাত এক অপরিসীম আনন্দের বোধ সঞ্চারিত হয়। সেই আনন্দ থেকেই কবিতার প্রেরণা জাগে। বৈষ্ণব পদকর্তা লিখেছেন,

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে বিসরি পুন তোহে সমাওত
সাগর-লহরী সমানা॥

এখানে আদিঅন্তহীন এক পরম আনন্দের আশ্রয় কবি-চিত্তে প্রেরণা জাগিয়েছে। পারাবারে যেমন কোটি কোটি তরঙ্গের উত্থান-পতন নিত্যই ঘটে চলেছে, সেই পরম আনন্দস্বরূপের চেতনায় তেমনি এই জীবলীলার প্রবাহ। আর একটি গানে ভক্ত বলেছেন,

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ন ছোড়বি মোয়॥

ভক্তির কবিতা এই পরম বিশ্বাসবোধের কবিতা। ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সর্বভাবে আত্মসমর্পণ, আরাধ্য দেবতা সম্বন্ধে মধুর অধীনতাবোধ এই জাতীয় কাব্যের উৎসস্বরূপ। প্রিয় বস্তুর প্রতি আশ্রয়বোধের আনন্দেই এর জন্ম। মাধবের অভিমুখে ভক্তের কাতর মিনতি কাব্যের বাহনে এইভাবে ধ্বনিত হয়েছে। পৃথিবীর যাবতীয় ভক্তিরসাত্মক

ভক্তির কবিতা

কবিতার মূলগত ভাবটাই হলো এই,—এই বিশ্বাস এবং সমর্পণ। নীলকণ্ঠ অধিকারীর গানে আছে,

আমি আর কিছু ধন চাইনা কেবল চরণ-ভিখারী
যে পদ এই ভব, জানে না বৈভব, ভবার্ণব তরণ-তরী।

বিদেশী কবি Christopher Harvey প্রায় একই কথা বলেছেন ভিন্ন ভাষায়,—বাংলা অনুবাদে যা দাঁড়ায় অনেকটা এই রকম—

ব্যাকুল মনের ভাবনা কোথায় পরম রতন আছে।
বিশ্বে কোথায় মিলবে গো তা'
সেই তো আদি, কেন্দ্রও তা'—
যা কিছু সব তারই আলোয় বাঁচে।

যে কথা Solomon-এর গানে অথবা David-এর স্তোত্রে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হতে শোনা গেছে, বাংলাদেশে সেই কথাই বলেছেন চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত,—বিহারে বলেছেন বিদ্যাপতি,—বৃন্দাবনে মীরাবাঈ। জীবলোক এবং জড়পদার্থের আশ্রয় স্বরূপা সেই পরমাশক্তির উপলব্ধিতে যে আনন্দ এবং আত্মসমর্পণের প্রেরণা জাগে, তারই ফলে কবির কণ্ঠে ভক্তির কবিতা আসে। ভারতবর্ষের ভক্ত কবীব এই আনন্দেই বলেছিলেন,—

'ইস্ ঘট্ অন্তর বাগবাগীচা'

—এই মাটির পাত্রটার মধ্যেই সৃষ্টিকর্তা কতো কাননের আনন্দ লুকিয়ে রেখেছেন,—কতো সমুদ্রের নীলিমা, কতো আকাশের জ্যোতিষ্ক।

কীর্তন-প্রসঙ্গ

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে কীর্তনের জন্মকাল সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলার নিজস্ব অবদান, এই কীর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসলে প্রথমেই চৈতন্যভাগবতের সেই শ্লোকটির কথা মনে পড়ে :

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।

চৈতন্যভাগবতকারের বর্ণনা অনুসারে চৈতন্যদেব এবং নিত্যানন্দপ্রভু এঁরা দু'জনেই হলেন সংকীর্তনের জন্মদাতা।

'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থের দ্বিতীয় লহরীর পূর্বভাগে কীর্তনের একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—"নামলীলাগুণাদীনা মুচ্চৈর্ভাবাতুকীর্ত্তনং", অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে নাম, লীলা, গুণাদির উচ্চারণ করাকেই বলে কীর্তন। অভিধানে 'সঙ্কীর্ত্তন' শব্দের অর্থ দেওয়া হয়, 'সম্যক্ প্রকারে দেবতার নামোচ্চারণ'। এই অর্থে ব্যবহৃত সংকীর্তন বা কীর্তন মহাপ্রভুর সমসাময়িক বাংলা দেশে তো ছিলোই—এমন কি তাঁর আবির্ভাবের বহু পূর্বকালে সুদূর বৈদিক যুগেও

সংকীর্তনপ্রথা ভারতবর্ষে অপরিচিত ছিল না। সামমন্ত্র তাই সামগান নামেই অভিহিত।

চৈতন্যদেব জন্ম গ্রহণ করেন ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে। সে রাত্রে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে নগরবাসীরা দলে দলে সংকীর্তন সহকারে গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে নিজনিজ গৃহ ত্যাগ করেছিলেন।

এই সব ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, বৃন্দাবন দাস তাহলে কোন্ অর্থে শ্রীচৈতন্যকে সংকীর্তনের জন্মদাতা বলে গেছেন? কবি কর্ণপুর, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতির অভিমত আলোচনা করলে বৃন্দাবন দাসের সঙ্গে তাঁদের ঐক্য দেখে বিহ্বল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় লিখেছেন, "আমার বোধহয় ইহার তাৎপর্য এই যে, শ্রীচৈতন্য কীর্তনকে ভক্তিধর্মের প্রধান বাহনরূপে যে ভাবে ব্যবহার করিলেন, পূর্বে আর কখনও তেমন হয় নাই।"

বর্তমান কালে কীর্তনে নৃত্যের বিশেষ স্থান নেই। কিন্তু গৌরাঙ্গ-প্রবর্তিত কীর্তনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল নৃত্য। অদ্বৈতাচার্যের গৃহে, নীলাচলে, নবদ্বীপে নগরসংকীর্তন কালে নৃত্য মহাপ্রভুর কীর্তনের একটি বিশেষ অংগ ছিল।

"আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস
মধ্যে নাচে আচার্য্য গোসাঞী পরম উল্লাস
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র
তার সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ।
—চৈতন্যচরিতামৃত। আদিলীলা ১৭!

॥নব্যসংস্কৃত কীর্তনের জনক চৈতন্যদেব। তাই নব্য কীর্ত্তনের আসরে মূল সংগীতের প্রারম্ভে মহাপ্রভুকে স্মরণ করাই রীতি। যে রসের গান হয় সেই ভাবোচিত গৌরাঙ্গবিষয়ক একটি পদকীর্ত্তন প্রারম্ভেই কর্ত্তব্য। একে বলে গৌরচন্দ্রিকা। এই গৌরচন্দ্রিকার প্রথম প্রচলন হয় খেতরীর মহোৎসবে। নরোত্তম ঠাকুর এই উৎসবক্ষেত্রে পালা সাজিয়ে গান করেছিলেন এবং তিনিই সর্বাগ্রে গৌরচন্দ্রিকা গানের প্রচলন করেন। নরোত্তম চৈতন্যপরবর্তী যুগের লোক এবং কবি জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস প্রভৃতির সমসাময়িক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নব্য কীর্ত্তনের গঙ্গোত্রী চৈতন্যদেব এবং এই প্রবাহের উল্লেখযোগ্য একটি বাঁক খেতরীর উৎসবক্ষেত্রেই সূচিত।॥ ক্রমশঃ কীর্তন গানের নানা পদ্ধতির আবির্ভাব হলো। এই বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির নাম গরাণহাটী, মনোহরসাহী, রেণেটি, মন্দারিণী। এই পদ্ধতিগুলি বিভিন্ন সুর বা stlye-

বাচক। রাজসাহী জেলার গড়েরহাট থেকে 'গরাণহাটি' নামের সৃষ্টি। বর্ধমান জেলার মনোহরসাহী পরগণায় (গরাণহাটি সুর সৃষ্টির প্রায় সমকালেই) মনোহরসাহী ঢঙের জন্ম হয়। জনশ্রুতি অনুসারে শ্রীনিবাস আচার্য্যকে এই পদ্ধতির জনক বলতে হয়। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর 'কীর্ত্তনগীতি প্রবেশিকা' গ্রন্থে বলেছেন, "গরাণহাটী ও মনোহরসাহী কীর্তনের মধ্যে প্রভেদ এই যে গরাণহাটী সুর সরল, লালিত্যপূর্ণ ও গম্ভীর, আর মনোহরসাহী কীর্তনের সুর অধিক কারুকলাবিশিষ্ট, সুললিত ও মধুর। উভয়ই উচ্চাঙ্গ কীর্তন এবং উভয়ই প্রাচীন পদ্ধতি।" রাণীহাটী পরগণায় রেণেটী এবং মেদিনীপুর জেলায় গড় মান্দারণেব নিকটবর্তী স্থানে মন্দারিণী ঢঙের উদ্ভব হয়। এই দুটী ঢঙই সরল। এই চারটি মূল পদ্ধতি ছাড়া এদের পরস্পর সংমিশ্রণ বা অন্যথাজাত বিভিন্ন সুরে বর্তমান কীর্ত্তনগীতিব প্রচলন আছে। কীর্তনের আলোচনা প্রসংগে 'জাত' এবং 'দাগী' এই দুটি শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই 'জাত' সুর বলতে বোঝায় মহাজন গায়ক-প্রদত্ত মূল সুর। জাত সুর চিহ্নিত গানগুলিকেই বলা হয় 'দাগী'।

কার্তন গানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এই

রীতিতে কথা এবং সুর—উভয়ের যথোচিত অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। পদাবলী শুধু সংগীত নয়, সাহিত্যও। তাই বাংলা দেশে বৈষ্ণব পদাবলীর অপরিমেয় আদর। কথার মিষ্টতার সঙ্গে সুরের মিষ্টতার এমন উদ্বাহবন্ধন রবীন্দ্র-সংগীতের মধ্যেও লক্ষিত হয়। এইখানেই হিন্দুস্থানী সংগীতের সংগে বাংলা গানের পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সংগীতবিষয়ক পত্রালাপ 'সুর ও সংগতি'তে এ বিষয়ে কবির অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। "বাংলা দেশে সংগীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্চে গান, অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ।" বাংলার অন্যান্য সংগীতেও এই বৈশিষ্ট্যটি চোখে পড়ে—যেমন, কবি, বাউল প্রভৃতি। এই বৈশিষ্ট্যটির আলোচনা প্রসংগে মনে রাখতে হবে যে, এই ধারায় কথাকেও অবহেলা করা হয় নি, সুরেরও অসম্মান ঘটে নি। রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে এই মতের সমর্থন চিত্তাকর্ষক: "আমাদের দেশে কীর্তন ও বাউল গানের বিশেষ একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল, তবুও সে স্বাতন্ত্র্য দেহের দিকে; প্রাণের দিকে ভিতরে ভিতরে রাগ-রাগিণীর সংগে তার যোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি।" ভারতবর্ষের সংগীতের ঐতিহ্য অনুসরণ করেও কীর্তনগান তাই একরকম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, বলা চলে। রবীন্দ্রসংগীতে

এই বিপ্লবেরই পুনরাবির্ভাব দেখা গেল। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় "যাঁরা বলেন, ভারতীয় গানের বিরাট ভূমিকার উপরে নব নব যুগের নব নব যে সৃষ্টি স্বপ্রকাশ তার স্থান নেই, ঐখানে হাতকড়িপরা বন্দীদের পুনঃ পুনঃ আবর্তনের অনতিক্রমণীয় চক্রপথ আছে মাত্র এমন-তব নিন্দোক্তি যাঁরা স্পর্দ্ধা সহকারে ঘোষণা করে থাকেন তাঁদেরই প্রতিবাদ করবার জন্যই আমাব মতো বিদ্রোহীদের জন্ম"—সেই প্রতিবাদ বাংলার কীর্তনকাররাও ভিন্ন প্রণালীতে করে গেছেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ

ইতিহাসকে অস্বীকার করে নয়, ঐতিহ্যসূত্রের মধ্যে অভূতপূর্ব রঙের ছোপ লাগানোই প্রতিভার কাজ। সে একটা চমক,—যেমন আকস্মিক, তেমনই গভীর। তাতে সমস্ত অতীত যায় ম্লান হয়ে, সেখানকার হাজার অস্তিত্বের জটলা হয় অস্পষ্ট ; শুধু শাণিত, উজ্জ্বল, প্রখর বর্তমানের দীপ্তিতে মানুষের চেতনাকে অভিভূত করা-ই তার কাজ।

পূর্ববঙ্গগীতিকার কথা বাদ দিলে প্রাচীন বাংলা কবিতা ছিল প্রধানতঃ ধর্মমূলক। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই প্রথম এই সোজা পথে প্রকাণ্ড এক বাঁকের প্রথম সূচনা দেখা যায়। ভারতচন্দ্র অবশ্য ধর্মকে নির্বাসন দেননি। "অন্নদামঙ্গল"—এই নামটি এক সঙ্গে দুটি ঘোষণা নিয়ে উপস্থিত, তার প্রথমাংশে ভাবের প্রাচীনতা, তার উত্তরাংশে রূপের প্রাচীনতা। বাংলা কাব্যে তখনও প্রাচীন কাব্য-রূপের মাধ্যমে অভ্যস্ত ধর্মমূলক ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু এই দুয়ের কোনটির দিকেই ভারতচন্দ্রের আন্তরিক টান ছিল না। একদিকে তিনি যেমন লৌকিক আবহের মধ্যে অবতীর্ণ, অন্যদিকে তাঁর কাব্যে তেমনি

ছন্দোবৈচিত্র্য ও পরীক্ষাপ্রবণতাই প্রকট হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ প্রচলিত কাব্যাদর্শ অতিক্রম করে ভারতচন্দ্র অনেক দূর এগিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতিভাকে স্বীকার করতে হলে এ কথা না মেনে উপায়ান্তর নেই যে, প্রতিভা বহুলাংশে স্বয়ম্ভু, ঐতিহ্যের মন্থর অতিক্রান্তি সে স্বীকার করে না, সে আকস্মিক, সে উজ্জ্বল এবং অভূতপূর্ব।

ভারতচন্দ্রের পরে বাংলা কাব্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় যে শক্তিমানের আবির্ভাব হলো, তিনি মধুসূদন। ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং পশ্চিমের প্রভাব থেকে তিনি একরকম মুক্ত ছিলেন, বলা যায়। মধুসূদন যখন এলেন, তখন এদেশে পাশ্চাত্য প্রভাবের জোয়ার। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে, সনেটে, পাশ্চাত্য পুরাণোল্লেখ-বাহুল্যে বাংলা কবিতার আঙ্গিককে সমৃদ্ধ কবলেন বাংলা কবিতা তাঁর হাতে অনাস্বাদিতপূর্ব সৌন্দর্যে-মাধুর্যে মণ্ডিত হলো, তাব গতি হলো প্রখর, তার শক্তি হলো অসীম।

মধুসূদনের পরে অনেকগুলি মাঝারি লোকের ভিড়; তাঁদের মধ্যে একটু যাঁর মাথা উঁচু, তিনি নবীন সেন। আর দেখা গেল বিহারীলালকে—রবীন্দ্র-প্রতিভার

উন্মেষের দিনে যিনি ছিলেন কবিসার্বভৌমের পদ-প্রদর্শক।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঐ বছরের ২৫-এ বৈশাখ একটি স্মরণীয় দিন। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে বাংলা গদ্য শৈশব থেকে একেবারে যৌবনে পদার্পণ করেছিলো,—রবীন্দ্র-নাথের এই উক্তিটি স্মরণ করে তাঁর নিজের কার্য সম্বন্ধে অনুরূপ একটি মন্তব্য প্রকাশ করলেই তাঁর সম্বন্ধে,—তাঁর ধ্যানের বিশালতা ও তাঁর কীর্তির অভিনবত্ব সম্বন্ধে যথোচিত বিস্ময় প্রকাশ করা যাবে না। বাংলা কাব্যের প্রচলিত ধারার সঙ্গে রবীন্দ্র-কাব্যের যোগ অবশ্য ছিল, সে যোগের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে কেবল সংকীর্ণ কোন যোজকের. ছোটো হ্রদের সঙ্গে বিপুল সমুদ্রের যা মিলন ঘটায়! পশ্চিমের দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্যে পালিত বঙ্গদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যদিও তিনি আবির্ভূত হলেন, তবু ভারতীয় সভ্যতার, ভারতীয় সাহিত্যের এবং ভারতীয় সংস্কৃতিরই তিনি সাধক ছিলেন। এই আদর্শে আস্থা রেখেই তিনি "বিশ্বভারতী" গড়ে তুলেছেন; এই অনু-প্রেরণাতেই তিনি বলেছেন, I refuse to think that the twin Spirits of the East and the West of Mary and Martha can never meet.

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের আত্মবিকাশের মূলে দুটী জিনিস বিশেষ সহায়তা করছে—একটি হলো উপনিষদ, অন্যটি সংস্কৃত সাহিত্য। জন্মস্থান এবং মাতৃভূমির বাইরে বিরাট বিশ্বের প্রাঙ্গণেই তাঁর লীলা। বাংলা কবিতায় নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটালেন তিনিই।

প্রচলিত ধারা থেকে রবীন্দ্রকাব্যের যে বিচ্যুতি সে যাদুবিদ্যার গুণে নয়—অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের তাতে যথেষ্ট হাত আছে। স্বল্প ক্ষমতাবানের অধ্যবসায় শিল্পীর তুলির স্থূল চিহ্নের মতো—অসার্থক এবং বিসদৃশ। রবীন্দ্রনাথের আদি যুগের রচনায় অবশ্য এমন দৃষ্টান্তেব অভাব নেই। 'কবি কাহিনী' 'বনফুল' প্রভৃতি বচনা অপরিণত কবিমানসের পরিচায়ক। প্রতিভার প্রতিশ্রুতিও তাতে নেই বলা চলে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' asceticism বা বৈরাগ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়েছে। পরবর্তী কালে তাঁর কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।' সে যাই হোক্, বক্তব্যের কথঞ্চিৎ অভিনবত্ব ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আদি যুগের রচনায় বিশেষ মূল্যবান অন্য কিছুই ছিল না, এ কথা অসংকোচেই বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তা স্বীকার করেছেন এবং তাঁর সমস্ত লেখার যে সংগ্রহ-পুস্তক

কিছুদিন থেকে ক্রমিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে ('রবীন্দ্র-রচনাবলী') তার সাধারণ সংখ্যাগুলিতে এই সব লেখা তিনি প্রকাশ করতেও দেন নি ; 'কবিকাহিনী' 'বনফুল' প্রভৃতি রচনাগুলি প্রকাশের জন্য "বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়" একটি অচলিত সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সে কথা যাক। এই সব অপরিণত রচনার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, শুধু এইটুকু দেখা গেল যে প্রতিভা ঐতিহ্যের অলৌকিক অতিক্রান্তি নয়,—পক্ষান্তরে ব্যর্থতা, অক্ষমতা এবং অসার্থকতা উত্তীর্ণ হয়েই সে বিকশিত হয়।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রদেশের দেখা মেলে বৈষ্ণব কাব্যে। এই কাব্যের পরিধি ছোটো। কিন্তু এর গভীরতা অতল আর ভাষাও এখানে একরঙা, বৈচিত্র্যহীন। তবু বৈষ্ণব কাব্যের আবেদন রসিক পাঠকের কাছে কোনোদিনই পুরানো হয়না। মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও বৈষ্ণব কাব্য সম্পর্কে মোহ-মুক্ত ছিলেন না। ভানুসিংহ দেশের লোককে চমকে দিয়ে-ছিলেন। ব্রজবুলির নিখুঁৎ প্রয়োগে এবং ভাবের গভীর-তায় ভানুসিংহের পদাবলী শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে অন্তত কিছু পরিমাণে তুলনীয়। এবং এই প্রসঙ্গে উল্লেখ

করা যায় যে, ডক্টর নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় 'ভানুসিংহের পদাবলীকে' প্রাচীন কোনো এক বৈষ্ণব কবির পদাবলী ধরে নিয়ে একটি 'থিসিস' লিখে সে সময়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডাক্তার' উপাধি পেয়েছিলেন।

'ভানুসিংহের পদাবলী' ছাড়া, আদিযুগের রচনার মধ্যে সন্ধ্যাসংগীতেও রবীন্দ্রনাথের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে 'সন্ধ্যাসংগীতের' কবি দুঃখবাদী। এই দুঃখবাদ রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের রচনার একটি বৈশিষ্ট্য বলা চলে। অবশ্য 'প্রভাতসংগীতে' আশার কথা আছে—

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি"

তারপর 'কড়ি ও কোমলের' কবিতায় শোনা গেল 'মরিতে চাহি না আমি এ সুন্দর ভুবনে'। কিন্তু এই দুঃখবাদ কাটিয়ে উঠতে রবীন্দ্রনাথের অনেক সময় লেগেছিল।

'প্রভাত সংগীত' থেকেই রবীন্দ্র-প্রতিভার আশ্চর্য বিকাশ আরম্ভ হলো। তারপর একটি একটি করে কতো কবিতার বই-ই না প্রকাশিত হলো। 'মানসী', 'সোনার তরী', 'খেয়া', 'চিত্রা', 'চৈতালী', 'কাহিনী', 'কল্পনা', 'কথা', 'ক্ষণিকা', 'কণিকা'—কবি রবীন্দ্রনাথের কীর্তির আর সীমা নেই। কিন্তু মুখ্যতঃ কবি হলেও গভীর

অধ্যাত্মবোধ রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। স্থূল এবং বাস্তবের বর্ণনায় তিনি মন দেন নি। অসীমের সন্ধানে তিনি কাতর। 'নৈবেদ্যে' কবি এই অসীমের উদ্দেশ্যেই লিখেছেন।

'চলিব যখন তোমার আকাশ গেহে—
তব আনন্দ-প্রবাহ লাগিবে দেহে।'

গীতাঞ্জলী, গীতিমাল্য এবং গীতালিতে এই অসীম ছাড়া আর কথা নেই। সীমার প্রতি, স্থূলের প্রতি এই অমনোযোগের জন্য অনেকে মনে করেন, খাঁটি প্রেমের কবিতা রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই লিখতে পারেন নি। তাঁর প্রেম প্রেমাস্পদের প্রত্যক্ষ পারিপার্শ্বিক ছাড়িয়ে অসীমের উদ্দেশে রওনা হয়েছে।—

পক্ষান্তরে পেত্রার্ক, কাতুল্লুস্, দান্তে, বায়ার্ণ প্রভৃতি যে সব কবি সার্থক প্রেমের কবিতা লিখে গেছেন, তাঁরা সকলেই প্রেমাস্পদের রূপে-গুণে এবং রমণীয় সান্নিধ্য-স্বপ্নে কাতর ছিলেন। তাঁদের কাব্য নর-নারীর সম্পর্কের কমনীয়তা অবলম্বনে মুখর হয়ে উঠেছে। সংস্কৃত কাব্যেও নর নারীর দৈহিক ঘনিষ্ঠতার মাধুর্য বহুভাবে কীর্তিত হয়েছে। কালিদাসের বিরহী-বিরহিনীর বর্ণনার মধ্যে তাদের মিলনের আকাঙ্ক্ষা যখনই ধ্বনিত হয়েছে, তখন

শারীরিক উল্লেখ কিছু কম ঘটেনি। ওমর খৈয়ামের কাব্যে পার্থিব অস্তিত্বের নশ্বরতাবোধ সাকী ও সুরার সংযোগে করুণ মাধুর্য লাভ করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রেমের কাব্য রচনায় বৈরাগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের একটি মন্তব্য রবীন্দ্রকাব্যের,—রবীন্দ্র-চৈতন্যের স্বরূপ উপলব্ধিতে প্রভূত আলোকপাত করে। নীহারবাবু বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ যৌবনে বৈরাগী।' বস্তুতঃ, এমন অকুণ্ঠিত যৌবনের বীর্য এবং এমন স্বতোস্ফূর্ত ত্যাগের স্পৃহা পৃথিবীর অন্য কোনো কবির মধ্যেই বোধ হয় মূর্ত হয়ে ওঠেনি।

উপনিষদের প্রভাব তাঁর কবিমানসের গঠনে বিশেষ সহায়তা করেছে। তাঁর কাব্যে সমস্ত বহির্জাগতিক বর্ণনার নিভৃত গভীরতায় যে বাণী ধ্বনিত হয়েছে, সে হলো,

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় :—'আমার রচনার মধ্যে যদি কোনো ধর্মতত্ত্ব থাকে তো তবে সে হচ্ছে এই যে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ

প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ, যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত, আর একদিকে অদ্বৈত ; একদিকে বিদ্বেষ, আর একদিকে মিলন ; একদিকে বন্ধন, আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে ; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে, এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে।' *

তাই বলে জাগতিক ব্যাপারে নিস্পৃহ সন্ন্যাসী অথবা অপার্থিব গজদন্ত-মিনারের অধিবাসীও তিনি ছিলেন না। 'গীতাঞ্জলী'তে, 'বলাকায়', 'চিত্রায়' ইতস্ততঃ দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা কাব্যপ্রবাহে ঘূর্ণি সৃষ্টি করেছে বটে, কিন্তু অবিমিশ্র দর্শন আলোচনা তাঁর বৈশিষ্ট্য নয়। পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে তিনি সর্বদা সচেতন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, পরাধীনতার বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি চিরকাল বিদ্রোহী। 'নৈবেদ্যে' কবি লিখেছিলেন,

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।"

'ভারততীর্থ' নামক ছোটো একটি কবিতায় তিনি জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে ভারতবাসী মাত্রের প্রতি

* আত্মপরিচয়

মিলনের আহ্বান পাঠিয়েছেন। তাঁর স্বদেশী গানের সংখ্যাও কম নয় এবং নিতান্ত সাম্প্রতিক সমরানলেও তিনি যে ক্ষুব্ধ না হয়ে পারেন নি, 'প্রান্তিক'ই তা'র প্রমাণ।

সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে সকল কালে তাঁর সত্তার নিবিড় যোগ। তিনি বলেছেন, "আমি যে অজানার যাত্রী, সেই আমার আনন্দ।" তিনি পথিক ; বিপুল বিশ্বসৃষ্টির প্রথম প্রত্যুষেই তাঁর যাত্রা আরম্ভ হয়েছে—কতো দেশ, কতো কাল, কতো রূপের মধ্য দিয়ে চলেছে তাঁর অন্তহীন পথ। সে পথের শেষ নেই ; কবি বলেছেন, "আমাব এই পথ চলাতেই আনন্দ।" সৃষ্টির সকল খণ্ডতার মধ্যে —অবিশ্রান্ত গতি-ই সত্য। এই হ'লো রবীন্দ্রনাথেব জীবনদেবতা। সমালোচক বলেছেন জীবনদেবতা হচ্ছে কবির ever-evolving personality.

এই জীবনদেবতাকে যুক্তির জালে ধরা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিসুলভ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই সৃষ্টির অন্তর্নিহিত এই রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, জীবনদেবতার উপলব্ধি করেছেন। এই জীবনদেবতা চির-নবীন। সর্বপ্রকার জীর্ণতার অন্তরালে নবীন অঙ্কুরের বেশে তার অনির্বাণ অভিযান রূপায়িত। রবীন্দ্রনাথের

নিসর্গবিষয়ক কাব্যে তরুলতা-ফুলপল্লবের অক্লান্ত সমা-রোহের অন্তর্স্থিত যে প্রাণের বেদনা ধ্বনিত হয়েছে, সেও এই জীবনদেবতারই বন্দনা। ইংরেজ কবি Wordsworth-এর সঙ্গে এইখানে তাঁর দৃষ্টির সাদৃশ্য চোখে পড়ে। Wordsworth celandine-ফুলে, primrose-গুল্মে যে মৃত্যুহীন প্রাণের লীলা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতায় তার অনুরূপ অভিজ্ঞতা আত্মপ্রকাশ করেছে। 'বনস্পতির' উদ্দেশে 'বীথিকার' একটি কবিতায় এই কথাটিই ধ্বনিত হয়েছে :—

> প্রাণের নির্ঝরলীলা স্তব্ধ রূপান্তরে।
> দিগন্তেরে পুলকিত করে।
> তপোবন বালকের মতো
> আবৃত্তি করিছ তুমি ফিরে ফিরে অবিরত।

তাই মৃত্যু তাঁর কাছে ভয়ের সামগ্রী মনে হয়নি,—তাই বিচ্ছেদ তাঁর কাছে নিরর্থক। চিরসঞ্চরায়মান প্রাণ-স্রোতে তাঁর গভীর প্রত্যয় ছিল। যেমন Goethe, তেমনি রবীন্দ্রনাথ, উভয়েই অসীম আশার কবি,—গভীর প্রত্যয়ের কবি। মৃত্যুর স্বল্পকাল মাত্র পূর্বে কবি রবীন্দ্রনাথ তাই লিখতে পেরেছিলেন,

রাহুর মতন মৃত্যু
শুধু ফেলে ছায়া,
পারেনা করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত
জড়ের কবলে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।
প্রেমের অসীম মূল্য
সম্পূর্ণ বঞ্চনা করি লবে
হেন দস্যু নাই গুপ্ত
নিখিলের গুহা গহ্বরেতে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি। *

---

* শেষ লেখা।